দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক অবক্ষয়
— পৃঃ ২০

রাজনীতির বিষে মৃতপ্রায় বাঙ্গলার সংস্কৃতি
— পৃঃ ২৩

৭৩ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা।। ১২ এপ্রিল, ২০২১।। ২৯ চৈত্র - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২ ।। নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

সংকটে বাঙ্গালিয়ানা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

নববর্ষ বিশেষ সংখ্যা

৭৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা, ২৯ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১২ এপ্রিল - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কড়া কথাই এখন সমাজের পক্ষে উপকারী ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

মা-মাটি-ভাইপো ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

ময়নাকে ছোলা দিলে টিয়াকেও দেওয়া উচিত ▯ মকরন্দ পরাঞ্জপে ▯ ৮

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গৌরীশঙ্করদা ছিলেন দীপস্তম্ভের ন্যায় ▯ বলরাম দাসরায় ▯ ১০

বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের সংকট ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ১১

গঙ্গারিরাই থেকে বাঙ্গালি ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১৩

বঙ্গাব্দের সূচনা করেছিলেন শশাঙ্ক ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৫

বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ▯ প্রবীর ভট্টাচার্য ▯ ২০

রাজনীতির বিষে মৃতপ্রায় বাঙ্গলার সংস্কৃতি ▯ সুজিত রায় ▯ ২৩

১লা বৈশাখের ভাবনা ▯ সত্যকাম রায় ▯ ২৭

১লা বৈশাখ— বছর শুরুর বইপাড়া ▯ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ▯ ৩১

১লা বৈশাখ হিন্দুর জীবনে একটি বরণীয় দিন ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩৫

১লা বৈশাখে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বারপুজো ছিল দেখা মতো ▯ স্বপন সেনগুপ্ত ▯ ৩৯

নববর্ষে আমাদের চৈতন্যোদয় ▯ ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ ▯ ৪০

বিদেশি দর্শনের আফিম ছাড়ার সময় এসেছে ▯ পার্থসারথি গুপ ▯ ৪১

বাংলাদেশ মুসলমানদের যতটা, হিন্দুদেরও ততটাই ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ৪৩

মরুতীর্থ হিংলাজ ▯ ওমপ্রকাশ ঘোষরায় ▯ ৪৬

শুভ বাংলা নববর্ষে (১৪২৮) স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

With Best Compliments
From :

সকলের জন্য রহিল
বাংলা শুভ নববর্ষের
প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সৌজন্যে ঃ-
Ram Chandra Agarwal
Advocate

With Best Compliments
From :

LEADSTONE INTERNATIONAL LLP.

19, R. N. Mukherjee Road,

1st Floor, Kolkata 700 001

Ph. +91 33 2248 1789/ 1790

Email : leadstone.intl@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নববর্ষের পণ

সুদূর অতীতকাল হইতেই ভারতরাষ্ট্রের এক অতি প্রাচীন জনপদ বঙ্গ নামে পরিচিত। মহাভারতকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম প্রভৃতি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ নাম ইতিহাস স্বীকৃত। প্রাচীন বঙ্গদেশের বিস্তৃতি ছিল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশের বনাঞ্চল এবং পশ্চিমে মগধ সীমান্তে ছোটনাগপুরের এলাকা অবধি। এই বঙ্গদেশের অধিবাসীরা বাঙ্গালি নামে পরিচিত। তাহাদের ভাষা বাংলা। সুপ্রাচীন সংস্কৃতভাষা এই ভাষার জননী। আর পয়লা বৈশাখ বাঙ্গালির নববর্ষ। এইদিন বাঙ্গালি তাহাদের চিরাচরিত পূজাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নববর্ষকে বরণ করিযা লয়। শুধু তাহাই নহে, পার্থিব অপার্থিব সমৃদ্ধির জন্য শপথও গ্রহণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালির ভাবনা কবি প্রকাশ করিয়াছেন– 'নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা/ তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত লব দীক্ষা।' নব বৎসরের প্রথম দিনটিতে ঈশ্বরের নিকট স্বদেশি দীক্ষার পণ লইয়া বাঙ্গালি একদিন ভারতবর্ষের নবজাগরণ ঘটাইয়াছিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা আজ যাহা ভাবিতেছে, অবশিষ্ট ভারত আগামীকাল তাহা ভাবিবে।' সেই দিনগুলি ছিল বাঙ্গালির বড়োই গর্বের, বড়োই অহংকারের।

দুঃখের বিষয় হইল, রাজনীতির চাপে পড়িয়া বাঙ্গালির সেই গর্বের দিনগুলি তিরোহিত হইয়াছে। বঙ্গ সংস্কৃতি তথা বাঙ্গালিয়ানা সংকটের মধ্যে পড়িয়াছে। বাঙ্গালি অস্তিত্বহীনতায় ভুগিতেছে, আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগিতেছে। বাঙ্গালির প্রাণের বাংলাভাষার ইসলামীকরণ ঘটিয়াছে। এপার বাঙ্গলায়ও সেই চক্রান্ত পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। তথাকথিত বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকরা সেই চক্রান্তে ইন্ধন দিয়াছেন। বাঙ্গালির সংস্কৃতি, সাহিত্য, এমনকী তাহাদের আচার-ব্যবহার সবই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এই সব কারণেই বাঙ্গালি এক আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিবার কারণে বাঙ্গালি তাহার অর্ধেক ভূমিখণ্ড হারাইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও খণ্ডিত বঙ্গের বাঙ্গালির চেতনা জাগ্রত হয় নাই। তাই বোধ হয় নীরদ সি চৌধুরী বলিয়াছিলেন, রাজনৈতিক চাপে নবজাগরণ যুগের ধ্যানধারণা যখন বাঙ্গালির কাছে গৌণ হইয়া পড়িল, তখন হইতেই আমাদের অবনতির শুরু। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, যেইদিন হইতে আমাদের মধ্যে ধর্মজাগরণের উৎসাহ স্তিমিত হইয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতেই আমাদের অবনতির শুরু হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালির আপন হাতে গড়া সভ্যতার পতন হইয়াছে। সমাজবিদগণ বলিতেছেন, সভ্যতার পতনের কারণেই একটি জাতি আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকে। তাই দেখা যাইতেছে, একশ্রেণীর বাঙ্গালি তাহার আপন নববর্ষ ভুলিয়া মধ্যরাত্রিতে বিদেশি নববর্ষ পালনে মাতিয়া উঠিতেছে। যাহারা রক্তের হোলি খেলিয়া বঙ্গবিভাজন করিয়াছে, বাংলাভাষার যাহারা ইসলামীকরণ করিয়াছে, এমনকী বঙ্গাব্দের স্রষ্টা বঙ্গবীর শশাঙ্কের স্থলে বিদেশি শাসক আকবরকে বসাইয়াছে, সংস্কৃতি সমন্বয়ের নাম করিয়া তথাকথিত বাঙ্গালি রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা তাহাদের সহিত উদ্বাহু নৃত্য করিতেছে। একটি জাতির পরিচয় হয় তাহার ভাষায়, সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে। বাঙ্গালির কম করিয়া পাঁচহাজার বৎসরের ঐতিহ্য রহিয়াছে। বড়োই দুঃখের যে, একটি অতি নব্যগোষ্ঠী বিশ্বদরবারে নিজেদের বাঙ্গালি বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ফলস্বরূপ প্রকৃত বাঙ্গালি কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গ সংস্কৃতি তথা বাঙ্গালিয়ানার অবক্ষয় শুরু করিয়াছে এই বঙ্গের বিদেশি মতাদর্শপুষ্ট কমিউনিস্ট রাজনীতিকরা এবং তাহাদের ধামাধরা বুদ্ধিজীবীকুল। চৌত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা বাঙ্গালিয়ানার ভান করিয়া বঙ্গ সংস্কৃতিকে ধূলিধূসরিত করিয়াছে। তাহারাই সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙ্গালিয়ানার অধঃপতন ঘটাইয়াছে। তাহার পর রাজ্যের বর্তমান শাসকদল বঙ্গ সংস্কৃতির গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিয়াছে। স্বভাবতই বাঙ্গালির পৃষ্ঠদেশ দেওয়ালে ঠেকিয়া গিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও সুখের বিষয় হইল, বাঙ্গালি আবার তাহাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে কটিবদ্ধ হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ সমগ্র দেশের সহিত এই বাঙ্গলায়ও জাতীয়তাবোধের পরিবেশ নির্মাণ হইয়াছে। পুনরায় বাঙ্গালির বিবেক জাগ্রত হইয়াছে। নববর্ষের ক্ষণে কবিগুরুর ভাষায় বাঙ্গালি পণ করিতেছে—' তোমার ধর্ম তোমার কর্ম তব মন্ত্রের গভীর মর্ম/ লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া, ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা/ তব গৌরবে গরব মানিব, লইব তোমার দীক্ষা।' এই ঐকান্তিক পণেই বাঙ্গালি নূতনকে বরণ করিয়া স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হইবে।

সুভাষিতম্

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণাঃ ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ।

পরগুণপরমাণুং পর্বতীকৃত্য কেচিৎ নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।।

সৎপুরুষেরা কায়মনোবাক্যে অমৃতময়। তাঁরা ত্রিভুবনে পরোপকাররূপ সুধা বিতরণ করে নিজেরা সকলের প্রিয়পাত্র হন। অন্যের পরমাণুতুল্য গুণকে তাঁরা পর্বতপ্রমাণ জ্ঞান করেন ও নিজেদের হৃদয়ের বিস্তার ঘটান।

কড়া কথাই এখন সমাজের পক্ষে উপকারী

বিশ্বামিত্র

দিলীপ ঘোষ। গত পাঁচবছর রাজ্য-রাজনীতির চরিত্রটাই বদলে দিয়েছেন। সঙ্ঘের এই প্রচারকের হাত ধরেই রাজ্য বিজেপির উত্থান। রাজ্যে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হয়তো ছিল, কিন্তু রাজনৈতিক সংগঠন শক্তিশালী হওয়ার অভাবে ভোটবাক্সে তার প্রতিফলন ছিল না। ফলে হিন্দুদের বোকা বানিয়ে, একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অন্যায্য কিছু সুযোগসুবিধা দিয়ে গত ৪৪ বছর দুটি দল কায়েমি শাসনব্যবস্থা চালিয়ে গেছে। দিলীপ ঘোষের কৃতিত্ব তিনি ঠিক এই জায়গাতেই আঘাতটা করেছেন। ফলে একশ্রেণীর লোকের কায়েমি স্বার্থে বেশ ভালোমতো ঘা পড়েছে। তাদের দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশ মাঝেমধ্যেই শোনা যায়। এই হতাশার বহিঃপ্রকাশ দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-আক্রমণের রূপ নেয়।

অতি সম্প্রতি যে ঘটনাটি ঘটলো, তা হলো একটি জনপ্রিয় টেলিভিশন শোয়ে এক অভিনেত্রী তথা সঞ্চালক দিলীপবাবুকে প্রশ্ন করতে গিয়ে আক্রমণ করে বসলেন, 'আপনি আর কটূক্তি সমার্থক, আপনার কথায় বিতর্ক হয়' ইত্যাদি বলে। অন্য কেউ হলে ভদ্রতার খাতিরে এই অপমানে অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। কিন্তু তিনি অন্য ধাতুতে গড়া। তাই বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলেছেন, কটূক্তি আর বিতর্ক এক জিনিস নয়। তাঁর কথায় বিতর্ক হতে পারে, তবে সেটা যে কটূক্তি হবে তার কোনও মানে নেই। যে প্রেক্ষিতে এই বিষয়ের অবতারণা সেটা হলো দিলীপবাবুর মমতা ব্যানার্জিকে ব্যান্ডেজ বাঁধা পা দেখানোর জন্য খানিকটা কটাক্ষের সুরেই বারমুডা পরতে বলা।

ওইদিন এই প্রসঙ্গ তুলে দিলীপবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা পা জনসমক্ষে তুলে রাখছেন। এটা কোন শালীনতাবোধের পরিচয়? তিনি সেইসঙ্গে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন : কারুকে অসম্মান তিনি করেননি। কিন্তু সমাজ যেটাকে ভালো চোখে দেখে না, সেই বিষয়টা দিলীপ ঘোষ তুলে ধরবেই। কারণ তিনি সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। স্পষ্টবক্তা দিলীপ ঘোষের সঙ্গে যুক্তিতে না পেরে তখন সেই অভিনেত্রী নারী পরিচয়ের আড়ালে নিজেকে লুকোতে ব্যস্ত হলে দিলীপবাবু বলেন, 'যখনই যুক্তিতে হেরে যাচ্ছেন তখনই আপনি 'নারী', 'দলিত', 'সংখ্যালঘু' হচ্ছেন কেন? কোনরকম সেফগার্ড নেবেন না'। এরকম সচাপট উত্তর পেয়ে সেই অভিনেত্রীর মুখে অবশ্য আর কোনো কথা জোগায়নি। অক্ষমের কটাক্ষনিক্ষেপ করে মাইক্রোফোন ছাড়তে গিয়েও বিপদ, দিলীপবাবু পালটা কটাক্ষ ফিরিয়ে দেন 'আপনি ঠিক এই উত্তরটাই শুনতে চাইছিলেন' বলে। এই টিভি শোয়ের ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। দিলীপ ঘোষকে অপমান করতে গিয়ে অভিনেত্রীর নিজে মুখে ঝামা ঘষে চলে আসা ফেসবুকীয় বামপন্থীদের ভারী বিরক্ত করেছে। তারওপরে আবার দিলীপবাবুর অভিনেত্রীকে 'ন্যাকামি করবেন না' বলা যে নারীবাদ বিরোধী এটা বোঝাতে ফেসবুকে কতশত গবেষণা হয়ে গেল, তবুও তাদের গোষ্ঠীর বাইরে একজনকেও প্রভাবিত করতে পারা গেল না।

এর সঙ্গে দিলীপ ঘোষের আরেকটি সাক্ষাৎকারে কিছু শিল্পীর উদ্দেশে বলা কথা, 'গান করুন, নাচুন; যেটা পারেন, সেটাই মন দিয়ে করুন। রাজনীতি করতে এলে রগড়ে দেব', তা নিয়েও গেল গেল রব তোলা শুরু হয়েছে। ভোটের সময় এরকম হয়তো হয়েই থাকে। আমাদের বক্তব্য তা নিয়ে নয়। দিলীপ ঘোষ ঠাণ্ডা ঘরে বসা রাজনৈতিক নেতা নন। তিনি গ্রাম থেকে উঠে আসা, কুড়ি বছর সাধারণ পোশাকে সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা, পরবর্তীতে রাজনৈতিক মঞ্চে অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত এক ব্যক্তি। তাঁর নিউটাউনে সুবিশাল ফ্ল্যাটে থাকা নিয়ে এত কথা হয়, সেটা শুধুমাত্র তাঁর নিরাপত্তার জন্য। তিনি গ্রামবাঙ্গলার দলের কার্যকর্তা নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, শাসক দলের অত্যাচার প্রতিহত করতে গিয়ে তাঁর ওপরে গত পাঁচ-সাত বছরে সবচেয়ে বেশি আঘাত নেমে এসেছে। রাজ্যজুড়ে ওঠা হিন্দুত্বের হাওয়াকে তিনি সংগঠিত করেছেন। এর নিট ফল রাজ্যে বিজেপির ভোট পৌঁছে গিয়েছে চল্লিশ শতাংশে, আর বামেদের ভোট সাত শতাংশে নেমে এসেছে। সমীক্ষকদের আশা, খুব শিগ্‌গির হিন্দুত্বের পক্ষে রাজ্যবাসীর ভোট পঞ্চাশ শতাংশে এবং আব্বাস সিদ্দিকির সহযোদ্ধা বামেদের ভোট দুই শতাংশে ঠেকে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যেনতেন প্রকারে তাঁকে হেনস্থা করতে হবে, এই মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন অভিনেত্রী। তবে খুব সুবিধে করতে পারেননি।

একটা কথা বুঝতে হবে, চৌত্রিশ বছর বামেরা সমাজটাকে নির্বীর্য করে দিয়েছে। নিজেদের 'শিক্ষিত' প্রতিপন্ন করে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতদের দিয়ে 'বুদ্ধিজীবী' শ্রেণী তৈরি করেছে। তারাই এতদিন শুধুমাত্র 'পার্টি'র স্বার্থে সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে সমাজকে বিপথগামী করেছে। শিল্পী, লেখক, কবি কিংবা শিক্ষক হলেই যে 'বুদ্ধিজীবী' হওয়া যায় না; রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারী যে মার্কস, লেনিনের 'ভক্ত'কুলকে দিয়ে ভরাট করা যায় না, অন্ততপক্ষে নীতির প্রসঙ্গে এটা আমাদের বুঝতে হবে। এও বুঝতে হবে, ম্যালেরিয়া হলে আগেকার দিনে তেতো কুইনাইন খেতে হতো। আমাদের সমাজ পালটাতে হলেও আগেকার দিনের কুইনাইন- সেবনের মতো আপাত তিতা, কর্কশ কথাগুলো শোনার অভ্যাস করতে হবে। নইলে এই বিষবৃক্ষের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ◻

মা-মাটি- ভাইপো

দিদি,

আপনার ঘরে এটা কে? এক ভাইপোই তো সব মালপো খেয়ে নিল দিদি! আপনি কী জবাব দেবেন। এটা তো ঠিক যে আপনি অডিয়োগুলো সব শুনেছেন। না, অস্বীকার করবেন না।

শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি কথোপকথন সামনে এসেছে।' এর ভিত্তিতে তাঁর অভিযোগ যে, 'কয়লা ও গোরু পাচারের প্রায় ৯০০ কোটি টাকা ভাইপোকে পাইয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের যুবনেতা বিনয় মিশ্র এবং তাঁর আত্মীয় তথা পুলিশ আধিকারিক অশোক মিশ্র।'

কী বলছেন দিদি? ভোটের চাপ আর টেনশনে শুনে ওঠা হয়নি। তাহলে দিদি, আমি যা শুনেছি সেটাই বলছি। আপনি সময় সুযোগ করে একবার মিলিয়ে নেবেন। এক সরকারি অফিসারের সঙ্গে কয়লা পাচার-কাণ্ডে অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালার ঘনিষ্ঠ গণেশ বাগাড়িয়ার।

কী রয়েছে ওই অডিয়ো ক্লিপে? সেখানে 'অভিষেক'-এর নাম স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওই 'অভিষেক' যে আসলে আপনার ভাইপো। তবে আপনাকে বেশ সম্মান দিয়ে 'ম্যাডাম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যতই হোক বিদায়ী হলেও আপনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়াও রয়েছে 'বিনয় মিশ্র' নামের উল্লেখ। হ্যাঁ, ইনিই যুব তৃণমূল নেতা বিনয়। মোট ৮টি অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে।

সেই অডিয়ো ক্লিপগুলোতে দুই কণ্ঠস্বরে যে সব কথাবার্তা রয়েছে তা এই রকম :

১। অভিষেক ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা বিভিন্ন অবৈধ সূত্র থেকে অর্থ উপার্জন করেন।

২। আগে অভিষেকের কাছে কয়লা পাচার বাবদ মাসে ১৫ থেকে ২০ কোটি টাকা যেত। গত দু' বছর সেটা মাসিক প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ কোটি টাকা হয়েছে। অবৈধ কয়লা ব্যবসায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষা পেতে অনুপ মাঝির থেকে প্রতি মাসে এই টাকা নিয়ে অশোক মিশ্র দেন বিনয় মিশ্রকে। এর পরে বিনয় নিজের কাটমানি নিয়ে বাকিটা দেন অভিষেককে।

৩। বিনয় মিশ্র ২০১২-১৩ সাল থেকেই অভিষেকের হয়ে টাকার লেনদেন করে আসছেন। বিনয় মিশ্র হলেন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিষেকের প্রথান লোক।

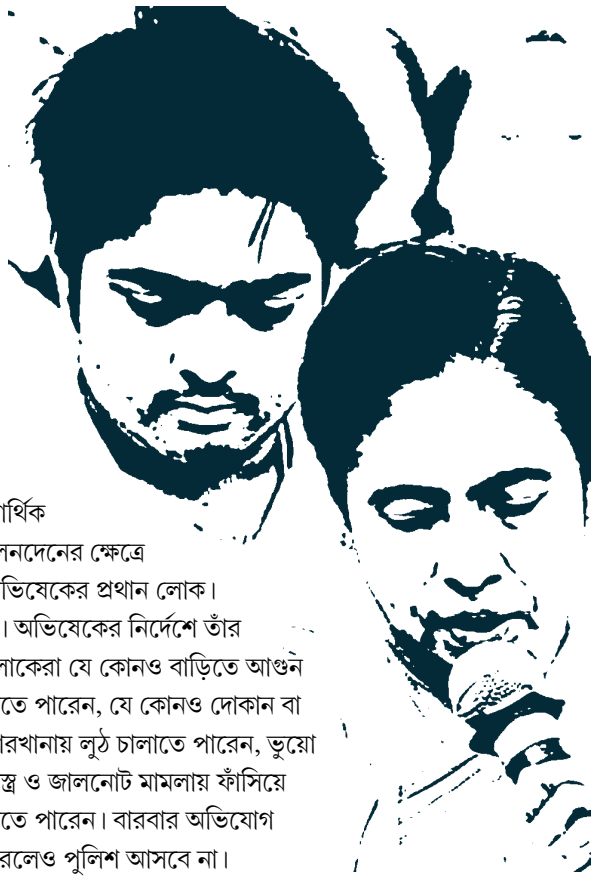

৪। অভিষেকের নির্দেশে তাঁর লোকেরা যে কোনও বাড়িতে আগুন দিতে পারেন, যে কোনও দোকান বা কারখানায় লুঠ চালাতে পারেন, ভুয়ো অস্ত্র ও জালনোট মামলায় ফাঁসিয়ে দিতে পারেন। বারবার অভিযোগ করলেও পুলিশ আসবে না।

৫। দিদির পরিশ্রমের ফলে যে রাজনৈতিক উত্থান এসেছিল তা অভিষেকের অর্থলিপ্সার জন্য শূন্য হয়ে গিয়েছে। ওঁর লক্ষ্য শুধু অর্থ উপার্জন। সরকার পরিচালনা বা রাজনীতি নয়, ওঁরা শুধু তোলাবাজিতে যুক্ত।

৬। অভিষেক এবং তাঁর বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ম্যাডাম ধৃতরাষ্ট্র হয়ে আছেন। আর সেই কারণেই প্রবীণ নেতারা দল ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা কোনও সম্মান পাচ্ছিলেন না।

৭। দিদি আগে প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে কাজ করতে চাননি। কিন্তু পরে হেরে যাওয়ার ভয়ে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তিনি রাজি হয়ে যান।

৮। রাজারহাটের যেখানে যেখানে নতুন নির্মাণ চলছে সেখানে সক্রিয় সিন্ডিকেট। তৃণমূল কর্মীরা নিম্নমানের সামগ্রীর বিনিময়ে সাধারণ মানুষের থেকে টাকা তোলেন।

আমি আর কিছু বলতে চাই না। দিদি পারলে শুনুন। □

অতিথি কলম

মকরন্দ পরাঞ্জপে

ময়নাকে ছোলা দিলে টিয়াকেও দেওয়া উচিত

বিদ্যাচর্চার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ শক্তিকে ঠেকিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাও শিক্ষাক্ষেত্রের এক ধরনের স্বাধীনতার অনুশীলন তো নিশ্চয়ই। সেই কারণে মূল প্রশ্ন এটা নয় যে শিক্ষাক্ষেত্রের স্বাধীনতা আক্রান্ত হয়েছে। বরাবরই এটা কোনো না কোনোভাবে ছিলই। প্রশ্ন হলো আমরা এটা নিয়ে কী ভাবছি। এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণকারী যাদের আদর্শ আমাদের পছন্দ নয় কেবল তাদেরই দোষ দেওয়া ক্ষুদ্র চিন্তারই নামান্তর। এই সূত্রে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা একটু ভাগ করে নিতে পারি। আমি জেএনইউ-তে ২০ বছর ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক ছিলাম। বলে রাখা দরকার আমার কার্যকালের গোটা সময়টাই আমি লাগাতার Leli (left liberal)-দের বিষ নজরে পড়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এর একটাই কারণ আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন যে তাদের সঙ্গে আমার ভাবধারা, চিন্তনের আদর্শগত বিরোধ। এরাই গোটা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়াত বলে আমি কেমন যেন 'হংস মধ্যে বক যথা' হয়ে যেতাম। আমাকে হীনমন্যতার শিকার করার নানান চেষ্টা চলত।

আমাকে যদি পরিস্থিতিটা বোঝাতে আজকের সর্বাধুনিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হয় তাহলে আরও সময়োপযোগী টার্ম হবে five B toolkit —অর্থাৎ আমাকে ব্র্যান্ডিং করে দেওয়া, ভয় দেখানো, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্যাতনের মোকাবিলা করানো, টিটকিরি দিয়ে বিভিন্নভাবে পেছনে লাগা ও শেষমেশ বয়কট করা। আর এগুলো কাজ না করলে 'ও নিপাত যাক'। এই কর্মকাণ্ডের কতকগুলি স্তর আছে। একেবারে প্রথমটি হলো, নির্দিষ্ট মানুষটির গায়ে লেবেল মেরে চিহ্নিত করে দাও। যেমন সঙ্ঘী, ভক্ত, ফ্যাসিবাদী সাধারণত এগুলিই বহুল প্রচলিত 'লে লি' (left liberal) সাম্রাজ্যে। সাধারণত এই প্রথম দাওয়াই দিয়েই কোনো বিরুদ্ধ মত জেগে ওঠার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়া চিহ্নিতকরণের পর সেই অপছন্দের শ্রেণীর জীবদের যে কোনো তীক্ষ্ণ অথচ নোংরা বাক্যবাণে বিদ্ধ করা কোনো ব্যাপার নয়। যেমন ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার দালাল, পুরাতান্ত্রিক প্রাগৈতিহাসিক, নারী বিদ্বেষী, হিন্দু জাতীয়তাবাদী, হিন্দু কট্টরপন্থী। এখানে শেষ নয় চাওয়ালা, যোগী, ভেকধারী ইত্যাদি। এই শব্দ বিশেষণগুলি একই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। অনেকটা হুইসিল বাজিয়ে ঘরের ভেতরে থাকা কুকুর বার করে আনার মতো। অতীতে যখন মার্কসবাদের বীর্যপুরুষ কমিটার্নের রমরমা ছিল তখন ধনতন্ত্রের কুত্তা বিশেষণটা বেশি চলত। কিন্তু এখন চলে ওই চিহ্নিতকারীদের বাতিল বা তামাদি দলে ফেলে দেওয়ার ক্যানসেল কালচার যা পরিচালনা করে সারা বিশ্বের শিক্ষা জগতের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে লালায়িত এবং একই সঙ্গে রাজনীতিগত ভাবে ঠিক থাকার স্বার্থান্ধ মানুষরা।

অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই তথাকথিত এই উদারবাদ প্রচারকরা ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা যূথবদ্ধ হয়ে ভিন্নমতাবলম্বীদের বধ করতে মাঠে নামে। আদতে তারাই সর্বাপেক্ষা অসহিষ্ণু ও পরমত বিদ্বেষী। তারা সর্বদাই তাদের মতের উল্টোদিকের মানুষগুলোর দ্বারা বিরুদ্ধচারণ সহ্য করতে পারে না। বিরুদ্ধাচরণের অধিকরের অস্তিত্বই তারা স্বীকার করে না। এই সূত্রে ২০১৭ সালে আমেরিকার রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রে অন্যতম সক্রিয় ও চরমপন্থী ভাবধারা পোষণকারী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে ক্যাম্পাসে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সভায় বিশ্বখ্যাত বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডফিন্সকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু শেষাবধি তাঁকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করেন। এর কারণ তাহলে কী ছিল? এই চরম অপমানের কারণ ছিল তিনি নাকি ইসলাম বিরোধী ছিলেন। এই অভিযোগ তিনি বারবার অস্বীকার করে এসেছেন। সকলেই জানেন এই অধ্যাপক সব রকমের ধর্মের বিষয়েই একটু কড়া মনোভাব রাখেন তার মধ্যে তাঁর নিজের খ্রিস্টধর্মও বাদ যায়নি।

এরপর নিজেদের বাড়ির কাছ থেকে আর একটা উদাহরণ তুলে আনা যেতে পারে। এটির সন্ধান পাওয়া যায় ভারতের সর্বাপেক্ষা সংস্কৃতিবান শহর কলকাতায়। অনেকের মনে পড়বে ২০১৬ সালের মে মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন প্রেক্ষাগৃহে তরুণ চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'বুদ্ধা ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' ছবিটি পূর্বানুমতি থাকা সত্ত্বেও সেটির প্রদর্শন আটকে দেওয়া হয়। শেষ মুহূর্তে বম্বে থেকে আনা ছবি বাতিল হওয়ায় পরিচালক-সহ অন্যান্যরা বিপন্ন বোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তথাকথিত 'লে লি' গ্যাঙের পড়ুয়ারা বিপুল উন্মাদনায় ছবিটির বিরোধিতা করে। নিজেদের উদারবাদী বলে অন্যদের দমিয়ে দেওয়ার বিকৃত বাসনা চরিতার্থ করেন। বিষয়টি নিয়ে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন পড়ে গেলেও 'লে লি' গোষ্ঠী দমে যাননি। তাঁরা পরিচালক অগ্নিহোত্রীকে ৮নং গেটের কাছে পেটান। সেই সময় জেএনইউ-তে বহু চর্চিত ছাত্র রোহিত ভেমুলার মৃত্যু নিয়ে খুব শোরগোল হয়েছিল। এই সুযোগে ভেমুলা প্রসঙ্গ তুলে একটি জানলার ভেতর থেকে অগ্নিহোত্রীর হাত ছিঁড়ে নেবার করার চেষ্টা হয়। 'ভেমুলার হত্যাকারী আখ্যা দিয়ে 'লে লি'রা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন। অথচ ভেমুলার সঙ্গে এ বিষয়ের কোনো সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত পরিচিতি কোনোটাই ছিল না। অগ্নিহোত্রী বাধ্য হয়ে যখন বলেন ভেমুলা খুন হননি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত 'লে লি' বাহিনী অশ্লীলতম গালাগালে তাঁকে আক্রমণ করেন। অগ্নিহোত্রী তখন চরম বিপন্ন। অতি সম্প্রতি প্রথিতযশা অধ্যাপক প্রতাপ ভানু মেহতা যখন অশোক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্তফা দিলেন সারা বিশ্ব থেকে সঙ্গে সঙ্গে ১৫০ 'লে লি' পণ্ডিত হুংকার দিয়ে উঠলেন— শিক্ষা জগতের স্বাধীনতার ওপর এ এক কদর্য হস্তক্ষেপ। জানতে ইচ্ছে করে যখন অগ্নিহোত্রীর চলচ্চিত্রের প্রদর্শন

বন্ধ করা সহ তাঁকে শারীরিক নিগ্রহ করা হয়েছিল তখন এদের মধ্যে কতজন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ডিন, পরিচালক প্রভৃতিদের কাছে চিঠি দিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর 'লেলি'-দের এমন জঘন্য আগ্রাসনের প্রতিবাদ করেছিলেন মেহেতা ও অগ্নিহোত্রী, তাহলে তো নিশ্চয় একজন আপেল অন্যজন কমলালেবু। কিন্তু একজনের ক্ষেত্রে এক ধরনের সোচ্চার প্রতিক্রিয়া অন্যজনের ক্ষেত্রে নিঃসীম নীরবতা— এমন বৈপরীত্য কেন। ময়নাকে ছোলা দিলে টিয়াকেও তো ছোলাই দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এ জিনিস দেখা যায় না। আর এটাই তাদের মস্ত ভুল যখন তারা দলের কেউ একটু ঘেঁটে গেলেই হল্লা তুলে ফেলেন। মানুষ এটা ধরে ফেলেছে, অবশ্য সময় নিয়েছে। শিক্ষা জগতের স্বাতন্ত্র্যের ওপর কোনো আঘাত আসেনি।

আর একটি উদাহরণ জরুরি। গত মাসে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইউনিয়নে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে সভাপতি নির্বাচিত হন রেশমি সামন্ত। তিনি সর্বাধিক ১৯৯৬টি ভোট পেলেও তাঁকে শেষমেশ পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তাঁর প্রাপ্ত ভোট আবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সকলের ভোট যোগ করলেও বেশি ছিল। তাঁকে হটিয়ে দেওয়ার কারণ তাঁর অতীত খুঁড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু পোস্ট আবিষ্কার করার পর সেগুলিকে অপরাধমূলক ধরে নিয়ে বা নিজেদের সঙ্গে খাপ খায় না ধরে এতবড়ো জয় সত্ত্বেও তাঁকে হঠানো হলো। তাঁর বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষ, সম্প্রদায়বাদ ইত্যাদি প্রচার করার অভিযোগ আনা হয়। এগুলিই তাঁকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গণতান্ত্রিকতার বলিদান করতে সুবিধে করে দেয়। এক্ষেত্রে বিদগ্ধ অক্সফোর্ডিয়ানদের কেউ একবারও উচ্চবাচ্য করলেন না যে, সামান্ত-এর 'শিক্ষাগত স্বাধীনতা'র কাছে। সে সেগুলি অনায়াসে সোচ্চার বলতে পারে। উলটো দিকে সেখানকার Post doctoral rescarcher অভিজিত সরকার সামন্তের আদি কর্ণাটক রাজ্যের গ্রামের ছবি Instagram-এ পোস্ট করে কদর্য ভাষায় তাঁকে ইসলাম বিদ্বেষী বলে গাল পাড়লেন। আর তার আদি উৎস প্রদেশটিকেও জঘন্য ইসলামি বিদ্বেষী অঞ্চল বলে তকমা দিয়েছিলেন। এখানে খেয়ে না খেয়ে তিনি সপাটে তাঁর মনের 'লে লি' মনোভাব প্রকট করে বললেন। ' এই সমস্ত দেশি বৌদ্ধিক শক্তি সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অক্সফোর্ড-এর মতো বিদগ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এমন সনাতনী প্রেসিডেন্ট চায় না (তাঁর ইচ্ছা সর্বোচ্চ ভোটে জেতাটা কিছু নয়। হায়!)। তাহলে এতদিন ধরে আমরা পরিস্থিতির কী পরিবর্তন করতে পারলাম। পেরেছি। এখন একটা ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। অভিজিত সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু বিদ্বেষ পোষণ ও ব্যক্ত করার জন্য বড়ো তদন্ত শুরু হয়েছে। সঙ্ঘী, হিন্দুত্ববাদী, সনাতনী তকমা পাওয়ারা আজ ছেড়ে কথা বলছে না। তারা প্রতিক্রিয়া তো দিচ্ছেই এবং যথাযথ প্রতিরোধও করেছে। অবশ্যই চোখের বদলে চোখ নিলে পৃথিবী গন্ধে ভরে যাবে— মহাত্মা গান্ধীর এই গাও বাক্য অবশ্যই রয়েছে। আচ্ছা আমি কী মহাত্মা বললাম নাকি বাপু বললাম। না এটাও চলবে না। আচ্ছা তিনি একজন বর্ণ বিদ্বেষী ছিলেন না? তিনি কি ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মেলাননি? একই সঙ্গে শিশু নির্যাতনকারীর কথাটাও ভুলে গেলে চলবে না। এই 'লে লি'রা এত সহজেই গান্ধীকে বাতিল করেছিল। তাহলে আমরা তো নগণ্য সনাতনী সেখানে কোন ছার। এই জন্যই প্রশ্নটিকে এভাবে বলা দরকার আমাদের এই সময় দাবি করে যে কোনো বিতর্ক মতভেদ যেন হিংস্র বিরোধিতার চিৎকারে ডুবিয়ে দেওয়া না হয়। শুধু ঘৃণা আর রাজনৈতিক ভাবে সঠিক থাকার বাধ্যবাধকতা শেষ কথা নয়। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নিয়ামক কখনই এই বিশাল দেশে একটি ক্ষুদ্র প্রায় পরিত্যক্ত কতিপয় স্বার্থান্ধ অহংকারী হতে পারে না। তারা বলবে দেশে বাকস্বাধীনতা নেই, শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিসিদ্ধ প্রতিবাদে সোচ্চার হব— এটিই এদের হঠানোর পন্থা।

(লেখক জেএনইউ-এর প্রাক্তন অধ্যাপক)

উত্তরপূর্বাঞ্চলে গৌরীশঙ্করদা ছিলেন দীপস্তম্ভের ন্যায়

বলরাম দাস রায়

স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী, আমাদের সকলের প্রিয় 'গৌরীদা' সঙ্ঘের অসম ক্ষেত্রে অনেকের পরামর্শদাতা ছিলেন। গৌহাটীর কটন কলেজের বিদ্যার্থী ছিলেন গৌরীশঙ্করদা। সেখান থেকেই বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। বাল্যকালেই পিতার হাত ধরে অসমের বরাকভ্যালির জালালপুর গ্রামে সঙ্ঘ প্রবেশ হয়েছিল। বরাকভ্যালির জালালপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে গৌরীশঙ্করদার জন্ম। পরিবারের সকলেই শিক্ষিত ও রুচিশীল। পিতা সঙ্ঘচালক ছিলেন।

তাঁরই প্রেরণাতে গৌরীশঙ্করদার সব ভাই স্বয়ংসেবক হয়েছেন। পিতা চা-বাগানের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বাগানের শ্রমিকদের তিনি খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। গ্রামগুলির উন্নতির জন্য সবসময় এই পরিবার সক্রিয় ভূমিকা পালন করত। এই কারণে গৌরীশঙ্করদার মরদেহ যখন সন্ধ্যার পর জালালপুর গ্রামে পৌঁছায়, বাগানের কয়েকশো শ্রমিক পরিবারের মা-বোন ও আত্মীয় পরিজনরা দীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন।

গৌহাটীতে পড়াশুনার সময় গৌরীদা তৎকালীন সঙ্ঘ প্রচারক ঠাকুর রামসিংহজীর সান্নিধ্য লাভ করেন। গৌহাটীর শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর আইন বিভাগে পড়াশুনার জন্য দিল্লি যান এবং সেখান থেকে প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। কয়েকবছর দিল্লিতে থাকার পর গৌহাটী মহানগরের প্রচারকের দায়িত্ব আসেন। গৌহাটী মহানগরে প্রচারকের দায়িত্বে থাকার সময়কালেই অসমের ধুবড়ী সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই বর্গে গৌরীশঙ্করদা মুখ্যশিক্ষক ছিলেন। গৌহাটী মহনগরের পর ডিব্রুগড় বিভাগে বিভাগ প্রচারক হন সেখানে বিভাগ প্রচারক ও প্রান্ত (সাত রাজ্য নিয়ে অখণ্ড অসম প্রান্ত) শারীরিক প্রমুখের দায়িত্ব দীর্ঘদিন পালন করেন। এরপর অসমের বরাকভ্যালি সম্ভাগ প্রচারকের দায়িত্ব নিয়ে শিলচর যান। অসমে প্রান্ত দুই ভাগ হবার পর দক্ষিণ অসমের প্রান্ত প্রচারক হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। নব্বই দশকের শেষের দিকে প্রান্ত প্রচারক থাকাকালীন সময়েই ত্রিপুরাতে বাঙ্গলার চার কার্যকর্তার অপহরণ ও হত্যা করা হয়। এর পরিণামে ত্রিপুরাতে স্বয়ংসেবকদের মধ্যে ও পরিবারে যে ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, গৌরীশঙ্করদা সেই সময় যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে বিষয়টা সামলে ছিলেন। ঠিক তার পরেই আমাকে শিলচরে বিভাগ প্রচারক ও প্রান্তপ্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল।

এরপর গৌরীশঙ্করদা অসম ক্ষেত্রের শারীরিক প্রমুখ, সহ-ক্ষেত্রপ্রচারক ও অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্ষেত্রের শারীরিক প্রমুখ থাকাকালীন অরুণাচলের পালক হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। সেখানকার সঙ্ঘকাজের পরিবেশ তিনি নির্মাণে এক বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অসম ক্ষেত্রের সমস্ত রাজ্যেই তাঁর সঙ্ঘ প্রবাস হতো। মধুর ব্যবহারের জন্য সব প্রান্তের স্বয়ংসেবকদের মধ্যে আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। সকলেই মনে করতো গৌরীশঙ্করদার নিকট গেলে কঠিন থেকে কঠিনতম সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। পরিবারেরই একজন সদস্য হিসেবে তিনি সবাইকে সুপরামর্শ দিতেন। অসম ক্ষেত্রে অনেক পরিবারে তিনি ছিলেন বড়ো ভাই বা বড়ো পুত্র। ২০১৮ সালে অনুশাসিত সৈনিকের মতো তিনি অসুস্থ অবস্থায়ও ডিব্রুগড়ে চলে যান।

শারীরিকে, বৌদ্ধিক বিভাগে, ঘোষ বিভাগে যেমন পারদর্শী ছিলেন ঠিক তেমন গীতগায়ক ও গীত রচনাকারও তিনি ছিলেন। পুস্তক লিখনও শুরু করেছিলেন। বেশ কয়েকটি হিন্দি ও অসমীয় পুস্তকের ভাষান্তর করেছেন। 'শ্রীগুরুজী দৃষ্টি ও দর্শন' এবং স্বর্গীয় দত্তোপন্তজীর লিখিত 'কার্যকর্তা' পুস্তকের অসমীয় ভাষাতে ভাষান্তর করেছেন। দশ বারোটি পুস্তকের ভাষান্তর করেছেন। ঘোষ বিভাগে পারদর্শিতা থাকার জন্য তাঁর দ্বারা অসম ক্ষেত্রে ঘোষে অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। পুস্তক পাঠ ও পুস্তক রচনাতে গৌরীশঙ্করদা যথেষ্ট রুচি রাখতেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করতেন। করোনাকালে সম্ভবত ডিসেম্বর মাসে গৌরীশঙ্করদা হঠাৎ ফোন করলেন, ঠিকানা চাইলেন। পনেরো দিন পরে দ্রুত ডাকযোগে চারটি পুস্তক আমার কেন্দ্র চুঁচুড়াতে পৌঁছে যায়। যে পুস্তকগুলি তিনি এই করোনাকালেই লিখেছেন তার মধ্যে একটি করোনা-১৯-এর উপর উপন্যাসও ছিল। প্রায় তিন বছর হয়ে গেছে আমার অসম থেকে চলে আসা, কিন্তু তিনি ঠিক আমাকে মনে রেখেছেন। এই করোনাকালেও তিনি ডিব্রুগড়, শিলচরে ও গৌহাটীর বিভিন্ন স্থানে প্রবাস করছিলেন। চার বছর পূর্বে এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে সেই সময় অপারেশনও করতে হয়েছিল। তাসত্ত্বেও তাঁর প্রতিটি সময় কাজে লাগুক সেই চিন্তাকে সবসময় নিজেকে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতেন। জীবনদীপ নিভে গেলেও গৌরীশঙ্করদার জীবনস্মৃতি সকলকে প্রেরণা দিয়ে যাবে। পার্থিব দৃষ্টিতে তিনি আজ অনুপস্থিত কিন্তু স্মরণে, মননে ও চিন্তনে অনেকেরই হৃদয় মন্দিরে স্থান করে নিয়েছেন।

(লেখক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ)

বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের সংকট

বিনয়ভূষণ দাশ

এই সময়ে বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের যে সংকট দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জেনে নিতে হবে আমরা 'সংস্কৃতি' বলতে কী বুঝি আর বাঙ্গালির সংস্কৃতিই বা কী। সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায়, কোনো একটা বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, তাঁদের সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য, নাট্য, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয় তাই হলো সংস্কৃতি। অর্থাৎ সামাজের সদস্য হিসেবে অর্জিত নানান আচরণ, যোগ্যতা এবং জ্ঞান ও মেধা, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আদর্শ, আইন, প্রথা ইত্যাদির এক যৌগিক সমন্বয় বা সংহতি হলো 'সংস্কৃতি'।

বঙ্গ সংস্কৃতি বলতে আমরা বোঝাতে চাই সেই সংস্কৃতিকে যা অখণ্ড ভারতবর্ষের 'বঙ্গ' বা বাঙ্গলার অধিবাসীদের সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, খাওয়াদাওয়ার রীতি, পোশাকআশাক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ইত্যাদির একটা যৌগিক সমন্বয়। বঙ্গ সংস্কৃতির রয়েছে হাজার হাজার বছরের এক উজ্জ্বল ও ঐতিহ্যশালী ইতিহাস।

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এবং মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই 'বাঙ্গালি সংস্কৃতি'। এবং এই সংস্কৃতি, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টিকাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত যে সকল কাব্যে, কবিতায় ও অন্য সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাই 'বাঙ্গালা সাহিত্য'। আমরা এই সঙ্গে যোগ করতে চাই, যারা শুধু বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা নয়, গত পাঁচ সহস্র বৎসর ধরে চলে আসা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও অংশীদারত্ব স্বীকার করে তাঁরাই সঠিক বাঙ্গালি সংস্কৃতির অঙ্গ। বাঙ্গালি সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য হাজার বছরের বেশি পুরনো। সপ্তম শতাব্দীতে লেখা বৌদ্ধ দোহার সংকলন চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় রচিত হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' ইত্যাদি অপূর্ব গ্রন্থসমূহ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য ও গদ্যসাহিত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাঙ্গলার ঐতিহ্যগত সংগীত ও সংগীতধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'রবীন্দ্রনাথের গান' যেখানে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

বাঙ্গলার এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এই অঞ্চলের হাজার হাজার বছরের পুরানো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় যে, খাদ্যাভ্যাসের কারণে বাঙ্গালিদের নাম 'ভেতো' বাঙ্গালি। মুসলমানরা এদেশে ধান আনেননি, ধানের চাষ এ অঞ্চলে আরম্ভ হয়েছিল অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে। পরে কখনো তুর্কি, কখনো আফগান, কখনো মোগল এবং সবশেষে ইংরেজরা বঙ্গভূমি দখল করেছেন, তবু বাঙ্গালিদের ভাত খাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন হয়নি। ভাত বাঙ্গালির একটি সাংস্কৃতিক খাবার, যার কারণে বলা হয়ে থাকে মাছে-ভাতে বাঙ্গালি।

বাঙ্গালি সংস্কৃতির অন্যান্য অনুষঙ্গ হলো তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিভিন্ন দিক।

কিন্তু এহেন বাঙ্গলা সংস্কৃতির উপরও আঘাত এসেছে; এখনো সে আঘাত ক্রমবর্ধমান। আঘাতটা প্রথম শুরু হয়েছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে, মুসলমান আক্রমণের সময় থেকে। প্রথমদিকে আঘাতটা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও তার প্রভাব বাঙ্গালির ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে ব্যাপকতর হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। মুসলমান আক্রমণকারীদের পাশাপাশি যে পির, দরবেশরা এদেশে আসে তারা কখনো নিজেরাই, কখনো বা শাসকদের সাহায্য নিয়ে এখানকার হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনুপ্রবেশ করে। অনেক সময় তারা এজন্য ছলের আশ্রয় নিতেও দ্বিধা করেনি। মুসলমান পির সৈয়দ সুলতান মুসলমানদের নবি হজরত মহম্মদের জীবনী অবলম্বনে লিখলেন 'নবীবংশ'। সৈয়দ সুলতান স্ব-সমাজে ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির সেসব প্রভাবকে মনে-প্রাণে বরণ করে নিতে পারেননি। তাই স্বতন্ত্রভাবে ও ব্যাপকভাবে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

কাব্যের আকারে লেখা এই পুস্তকে নবিকে দেখানো হলো এক অবতার রূপে; এছাড়া বিভিন্ন পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবীকেও নবিদের ধারাভুক্ত করা হয়েছে এই কাব্যে। নবীর আগেকার অবতার হিসেবে দেখানো হয়েছে হিন্দু অবতার শ্রীকৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি হিন্দু দেবতা এবং মহাপুরুষগণকে আর শেষ অবতার ও

সংকট থেকে বাঙ্গালিকে বেরিয়ে আসতে হলে তাঁকে তাঁর শিকড়ে ফিরতে হবে, তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার যা কিছু ভালো, গৌরবময় তাঁকে পরমযত্নে লালন করতে হবে, আগলে রাখতে হবে। দরজা খুলে রাখতে হবে যা কিছু ভালো তাকে গ্রহণ করার জন্য, আর যা কিছু মলিন, যা কিছু জীর্ণ তাকে বের করে দিতে হবে জানালা দিয়ে।

আধুনিক নবী হিসেবে দেখানো হয় হজরত মহম্মদকে। অর্থাৎ নবীর ধর্ম ও পরম্পরা হিন্দুদের ধর্মেরই আধুনিক রূপ এই কথা সবাইকে বোঝানো হলো যাতে করে হিন্দুরা মনে করে এই মুসলমান ধর্ম তাঁদেরই পূর্বপুরুষের অনুসৃত ধর্মেরই বর্তমান রূপ। এই ছলের মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ, অশিক্ষিত হিন্দুদের প্রলুব্ধ করে, ধর্মান্তরিত করে মুসলমান ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এজন্য পির, দরবেশরা শক্তিও প্রয়োগ করত। মার্কিন ঐতিহাসিক রিচার্ড এম ইটন তাঁর Essays on Islam and Indian History গ্রন্থে লিখেছেন, 'The work (i,e. Nabi-Bansa) treats the major deities of the Hindu pantheon, including Brahma, Vishnu, Siva and Krishna, as successive prophets of God. By commenting in this way on Vedic, Vaishnava and Saiva divinities, the Nabi-Bansa fostered the claim that Islan was the heir to the religious traditions of pre-Muslim Bengal. (p. 270) ছল-চাতুরির সাহায্যে হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো সৈয়দ সুলতানের এই 'নবী-বংশ'। আবার সুলতানি আমলে তাঁদের দরবারে স্থানীয় ভাষা কিছুটা চালু থাকলেও পোশাকআশাক, রীতিনীতি, আদবকায়দা সবকিছুই বহিরাগত পদ্ধতিতে হতো। বাঙ্গলায় নবাবি আমলে অবস্থা আরও খারাপ হয়। নবাবদের দরবারে স্থানীয় ভাষা বাংলা, বাঙ্গালিদের চিরাচরিত পোশাকআশাক সবকিছুই নিষিদ্ধ করা হয়। বাঙ্গলার স্থানীয় ভাষা, পোশাকআশাক, রীতিনীতি সবই আশ্রয় গ্রহণ করে হিন্দু জমিদারদের বৈঠকখানায়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এবং এখনও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণেও তাঁদের দ্বিধা দেখা গেছে। মোগল আমল থেকেই বাঙ্গলার রাজধানী ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলে 'আশরাফ সমাজ' গড়ে ওঠে এবং তাঁরা ফারসি-আরবি-উর্দু চর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আশরাফ মুসলমানেরাই ঘোষণা করে, তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দু। তাঁরা অন্যান্য বাঙ্গালি মুসলমানদেরও বোঝাতে চেষ্টা করে, বাঙ্গালি মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দু। আরবি-ইরানি-তুর্কি সংস্কৃতির এই ধারকেরা বাংলা ভাষা হিন্দুর ভাষা বলে ঘৃণা করতে শেখায়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মহমেডান লিটারেরি সোসাইটির সদস্যরা নিজেরা বাংলা ভাষায় অজ্ঞ ছিল এবং তীব্র বাংলা বিদ্বেষী ছিল। তাঁরা নিয়মিত বাংলা বিরোধী বক্তব্য রাখত এবং তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যম ছিল উর্দু, ফারসি, আরবি এবং ইংরেজি। এই সোসাইটি বাংলা ভাষাকে নিদারুণ অবহেলা করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মুসলমান ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন কিছু মুসলমান লেখকের আবির্ভাব হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে কলুষিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান যথেষ্ট ছিল। এইসব সাহিত্যিকদের মতে, 'মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের তমদ্দুন, মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা, মুসলমানের জীবনযাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে এবং তাতেই হবে মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা।' তাঁদের এই আত্মোপলব্ধির মূল কথা হলো, বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়, 'এর স্পিরিটও মুসলমানি নয়, এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।' ভাষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালি মুসলমানদের এই বিভেদবোধ আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ১৯৪৪ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) অনুষ্ঠিত 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ' সম্মেলনের সময় থেকে। আবুল মনসুর আহমেদ এই সম্মেলনে বলেন, 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানেরা যে আলাদা জাত, এতে তর্কের কোনো জায়গা নেই।' এইভাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রভাব সাহিত্য সংস্কৃতির মুক্ত অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়ে। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে মুসলিম লিগের নেতৃত্বে বাঙ্গলার নানা স্থানে উর্দু অ্যাকাডেমি গড়ে উঠে। তাঁদের পরিচালনায় ওই সংস্থাগুলি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করে, বাংলা মুসলমানদের ভাষা নয়, তাঁদের ভাষা উর্দু। যদিও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং এ.কে. ফজলুল হকের অনুপ্রেরণায় গড়ে ওঠা বেঙ্গলি প্রোটেকশন লিগ তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার শব্দাবলির মধ্যে প্রচুর উর্দু, আরবি, ফারসি শব্দ ঢুকিয়ে ভাষাটিকে একটি মুসলমানি রূপ দেবার চেষ্টা চলছে। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এই পশ্চিমবঙ্গেও বাংলা শব্দের মধ্যে নানা আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ঢুকিয়ে এটাকে একটি মুসলমান রূপ দেবার চেষ্টা চলছে। রামধনুকে রংধনু, আকাশকে আসমান, জলকে পানি, অভিনন্দনকে মুবারক বলা ও লেখা হচ্ছে। বাংলা ভাষার শিক্ষক চাইলে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে, প্রতিবাদ করলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়েছে দুই কিশোর— রাজেশ ও তাপসকে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামে শোভাযাত্রাও বার করা হচ্ছে। আর এই মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে এই পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও, বিশেষকরে মুর্শিদবাদ জেলায়। এই জেলাতে বাংলাদেশের তথাকথিত সংস্কৃতি আমদানি করার এক সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এই মঙ্গল শোভাযাত্রা বাঙ্গলা সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল না কোনোদিনই। বাংলাদেশ বাঙ্গলা নববর্ষের চিরাচরিত ঐতিহ্য চিহ্নগুলি বর্জন করে নতুন এক ইসলামপ্রাণিত নববর্ষ প্রচলন করার তাগিদেই এই মঙ্গল শোভাযাত্রা চালু করেছে। নববর্ষের চিরন্তন চিহ্নগুলি বর্জন করেছে বাংলাদেশ। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত নববর্ষকে আদৌ বাঙ্গলার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে একথা বলা যাবে না। এ ছাড়াও আছে জীবনযাত্রার নানান অনুষঙ্গে ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। অনেকের কাছেই বাংলার বদলে ইংরেজি হয়ে উঠেছে মাতৃভাষা। জন্মদিন বা জন্মতিথি নয়, বার্থডে হয়ে উঠেছে নতুন প্রজন্মের সেলিব্রেশান। অর্ধেক ইংরেজি, অর্ধেক হিন্দি মিশিয়ে এক খিচুড়ি বাংলা বলাই হয়ে উঠেছে আধুনিক বাঙ্গালির প্যাশন।

একদিকে বাংলদেশের মুসলমান বাঙ্গালিদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব। ফলে বাংলাভাষা ও বাঙ্গালি সংস্কৃতি আজ অস্তিত্বসংকটের ভয়ে ত্রস্ত। এই সংকট থেকে বাঙ্গালিকে বেরিয়ে আসতে হলে তাঁকে তাঁর শিকড়ে ফিরতে হবে, তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার যা কিছু ভালো, গৌরবময় তাঁকে পরমযত্নে লালন করতে হবে, আগলে রাখতে হবে। দরজা খুলে রাখতে হবে যা কিছু ভালো তাকে গ্রহণ করার জন্য, আর যা কিছু মলিন, যা কিছু জীর্ণ তাকে বের করে দিতে হবে জানালা দিয়ে।

(লেখক ইতিহাস গবেষক ও প্রাবন্ধিক)

গঙ্গারিরাই থেকে বাঙ্গালি

প্রবাল চক্রবর্তী

ওহে বাঙ্গালি, তোমার নাম কী? বলি, এ আবার কেমনধারা কথা? আমার নাম তো বললেই, 'বাঙ্গালি'! কিন্তু সেই নামটা এল কোত্থেকে? এখানেই গোলমাল। দশজন পণ্ডিত দশরকম তত্ত্ব দেবেন, সব গুলিয়ে যাবে। কিছু ব্যাপার আছে, যা বুঝতে পাণ্ডিত্য নয়, শিশুর সারল্য চাই। বঙ্গ থেকে বঙ্গাল, বাঙ্গালি নদীমাতৃক জাত, নদীর নামে সমাজের নাম, সেটাই স্বাভাবিক। নদীর নামে বাঙ্গালির কিন্তু আরেকটাও নাম আছে, 'গঙ্গাহৃদি'। এখানেই পণ্ডিতেরা উশখুশ করবেন। বাঙ্গালি আর গঙ্গাহৃদি কি এক? বাঙ্গালির জন্ম তো আজ থেকে মাত্র আটশো কী হাজার বছর আগে, মূলত পির শাহজালালের শ্রীহট্ট আক্রমণ থেকে। যার নামে ঢাকা বিমানবন্দর। তার আগের ইতিহাস তো অন্ধকার, ফাঁকা! আর গঙ্গাহৃদি, মানে গঙ্গারিরাই কিন্তু...

একটা গল্প বলি শুনুন। এক ভদ্রলোকের হাতে এল গুপ্তধনের নকশা। সঙ্গে জানতে পারলেন, নকশাটা হাতে পাওয়ার আগেই একটা দুষ্টু লোক নকশা থেকে গুপ্তধনের সন্ধানটা মুছে দিয়েছে। কী করা এখন? অনেক ভেবেচিন্তে শেষে গ্রামের পাঠশালে গিয়ে গুরুমশাইয়ের পরামর্শ চাইলেন। গুরুমশাই হেসে বললেন, এই ধাঁধার সমাধান জ্ঞানীর কম্ম নয়, শিশুর সারল্যই এর সমাধান করবে। মানচিত্রটা পাঠশালার এক বিদার্থীকে দিলেন। বিদ্যার্থীটি মানচিত্রের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে বলল, এইখানে আছে গুপ্তধন। ভদ্রলোক অবাক! বাছা, কী করে বুঝলে? বিদ্যার্থী বলল, খুব সোজা। মানচিত্রের সর্বত্রই কিছু না কিছু আঁকা লেখা আছে, কিন্তু এই জায়গাটা এক্কেবারে ফাঁকা! তার মানে এখানেই গুপ্তধন চিহ্নিত ছিল, মুছে ফেলার আগে।

ছোটোবেলায় বাঙ্গলার ইতিহাস পড়তে গিয়ে এমনটাই মনে হয়েছিল। কে যেন যত্ন করে আমাদের ইতিহাস মুছে দিয়েছে।

পাশ্চাত্যে ইতিহাস রাজশক্তি-কেন্দ্রিক। অন্ধ অনুকরণে আমরাও সেরকমই ইতিহাস খুঁজে বিফল হই। ভারতের, বিশেষত বাঙ্গলার ইতিহাস বুঝতে গেলে সমাজের ইতিহাসকে ধরতে হবে। সেখানেও সমস্যা। পাশ্চাত্যের চশমা-আঁটা পণ্ডিতরা বলবেন, চাঁদ সদাগর ইতিহাস নয়, গল্প। আরে, ইতিহাস তো রাজার সভাসদ লেখে, রাজাকে খুশি করতে। এ যুগের ফেক নিউজের মতো। তারচেয়ে লোকগাথা ঢের ভালো। কার্তিক পূর্ণিমায় কলার কাণ্ড দিয়ে নৌকো বানিয়ে জলে ভাসিয়েছেন নিশ্চয়ই, ছোটোবেলায়? সে যে আমাদের পূর্বজদের বাণিজ্যযাত্রাকে স্মরণ করা, কোনো সন্দেহ আছে কি তাতে? সেখানে ইতিহাস নেই?

আজকের বাঙ্গালি ও সেদিনের গঙ্গাহৃদি যে অভিন্ন, সেটা পরখ করার জন্য চলুন, আমাদের চেনা বাসস্টপ থেকে বাস ধরি। দেখি, বাসটা ইতিহাসের পরিচিত বিন্দুগুলো পার হয়ে গঙ্গাহৃদিদের সেই সোনায় মোড়া কিংবদন্তীর রাজধানী 'গাঙ্গেয়' নগরীতে পৌঁছয় কী না। এই যাত্রার প্রথম স্টপ আজ থেকে আড়াইশো বছর আগের বিক্রমপুর পরগনা। ইংরেজদের খতিয়ান বলছে, সে ছিল পৃথিবীর ধনীতম অঞ্চল। পাঠান-মোগলের অত্যাচারের মধ্যেও বাঙ্গালির ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলেফেঁপে উঠছিল। তাই তো কোম্পানি এখানেই প্রথম এসেছিল। এত সমৃদ্ধ একটা জাত, সে নিশ্চয়ই আকাশ থেকে পড়েনি?

এগিয়ে চললাম। পথে দেখা কাশীরাম দাসের সঙ্গে, সাড়ে তিনশো বছর আগে। দেখলাম বাঙ্গলায় মহাভারত লিখছেন। পদ্যে মহাভারত, যার সুর ঠাকুরমার মুখে শুনেছি। পরের স্টপ নবদ্বীপ, পাঁচশো বছর আগে। চৈতন্য মহাপ্রভু ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, একই টোলের ছাত্র। পাঠান রাজত্ব সত্ত্বেও নবদ্বীপের ভারতজোড়া খ্যাতি। যশোরের প্রতাপাদিত্য পর্তুগিজ জলদস্যুদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। এর এক শতাব্দী আগেই জন্মেছেন কবি কৃত্তিবাস, যাঁর লেখা বাংলায় রামায়ণ তুলসীদাসকে অনুপ্রাণিত করেছে অবধীতে রামায়ণ লিখতে। তুর্কি আক্রমণের মধ্যেও বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস এমন সব কাব্যরচনা করছেন, যা ভবিষ্যতে অমরত্ব পাবে।

এরপর বাস থামল ন-শো বছর আগে, সেন রাজত্বে। জয়দেব গীতগোবিন্দ লিখছেন, যা আজও গাওয়া হয় সারা ভারতে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যে। সেই কালখণ্ডে তৈরি হচ্ছে ঢাকেশ্বরী কালীমন্দির, বহু শতাব্দী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে, পাকিস্তানি খানসেনার আক্রমণ পর্যন্ত। আরেকটু এগোতেই

পৌঁছলাম বারোশো বছর আগে, পাল রাজত্বে। নাথযোগীরা যোগ শেখাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে। বাঙ্গালি শাসন করছে মূলতান থেকে আরাকান, লিখছে চর্যাপদ। প্রতিষ্ঠা করছে নালন্দা, সোমপুরা, বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়। দেবী তারার মহিমান্বিত তান্ত্রিক শৈব-বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে দিচ্ছে তিব্বত থেকে জাপানে। সেই সূত্রেই জাপানের বনজি, ফিলিপিন্সের বাবাইন হরফ বাংলা হরফের আদিরূপ 'সিদ্ধম্' থেকে নেওয়া। চর্যাপদ বলছে, সেযুগেও বাঙ্গালি মাটির দাওয়ায় বসে কলাপাতায় গরম ভাতে ঘি ঢেলে খেতো, সঙ্গে নালতে শাক, মৌরলা মাছ ও দুধ। মাছের জেনেটিক মেমোরি আমাদের কোষে কোষে। তাই বোধহয় বাঙ্গালি মাছের মতোই উজান ঠেলে সাঁতরাতে পারঙ্গম। পরের স্টপ চোদ্দশো বছর আগে, গৌড়েশ্বর শশাঙ্কর দরবারে। শোনা যায়, তিনি ছিলেন গুপ্তকুলোদ্ভব। ক্ষয়িষ্ণু কুলগৌরবের কাঁথায় আগুন দিয়ে তিনি বাঙ্গলাকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছিলেন, একা হাতে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মাকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন জীবনভর। আধুনিক বাঙ্গালির চরিত্র শশাঙ্কের ছাঁচে গড়া।

সামনের স্টপ সতেরশো বছর আগের মধ্যবঙ্গে। আজকের মুর্শিদাবাদে জন্মালেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রবর্তক শ্রীগুপ্ত। ভারতে স্বর্ণযুগ এল। এর পরের স্টপই আমাদের গন্তব্যস্থল। চাণক্যের কালখণ্ড আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের কালখণ্ড, আড়াই হাজার বছর আগে। সেসময় এক মজার কাণ্ড ঘটল। আলেকজান্ডার পঞ্জাব জয় করে পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছেন। গুপ্তচর মারফত শুনলেন, পুরুর ভাগ্নে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গঙ্গারিরাই (গঙ্গাহৃদি) রাজ্যে। আলেকজান্ডার বললেন, এত্তবড়ো সাহস! চলো তাদের ঠ্যাঙাই। গুপ্তচর বলল, মহারাজ, রহু ধৈর্যং! সামনে প্রাসী (মগধ), শক্তিশালী সাম্রাজ্য। যদি তাদের হারাতেও পারেন, গঙ্গাহৃদিদের রাজ্য বড়ো কঠিন ঠাঁই। কয়েক মাইল চওড়া গঙ্গার বিশাল বাহু তাকে আড়াল করে রেখেছে। সৈন্যসামন্ত নিয়ে যদি-বা সে নদী পার হলেন, ওপারে আছে গঙ্গাহৃদিদের আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, দু'লাখ পদাতিক, আট হাজার রথ, ছ' হাজার হাতি। শুনেই আলেকজান্ডার ঠিক করলেন, আর নয়, ঘরের ছেলের এবার ঘরে ফেরাই শ্রেয়। চাণক্যের লেখায় গঙ্গাহৃদির বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এমন যে গঙ্গাহৃদি, তাদের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি মূলত বিদেশিদের লেখা থেকেই। মেগাস্থিনিস, টলেমি, প্লিনি, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং, ই-সিং, পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী। নিজেদের কথা কি আমরা লিখিনি? নাকি আমাদের লেখা পুড়ে ছাই হয়েছে নালন্দায়, বিক্রমশীলায়? চর্যাপদ যদি নেপালে আশ্রয় না পেত, সেটাও হারিয়ে যেত। তাই গঙ্গাহৃদিদের বুঝতে গেলে আজ লোকগাথার সঙ্গে যুক্তিযুক্ত কল্পনারও আশ্রয় চাই।

বিদেশি ঐতিহাসিকরা বলছেন, ভারতের জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে গঙ্গাহৃদিরা ছিল সবচেয়ে সম্পন্ন ও শক্তিশালী। গাত্রবর্ণ রোদে-পোড়া তামাটে, উচ্চতায় মাঝারি। গঙ্গানদী যেখান থেকে দক্ষিণবাহিনী হয়ে সমুদ্রে মিশেছে, সেখানেই গঙ্গাহৃদিদের বাস। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী গঙ্গার পশ্চিমতম থেকে পূর্বতম মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গাহৃদি রাজ্য। রাজধানী দুর্গনগরী 'গাঙ্গেয়' নৌবাণিজ্যের বৃহত্তম বন্দর, যার ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকেতুগড়ে এখনও দেখতে পাবেন উত্তর চব্বিশ পরগনায় বিদ্যাধরী নদীর পাড়ে।

চাষবাসের পাশাপাশি ম্যানুফ্যাকচারিং ও সমুদ্রবাণিজ্য ছিল গঙ্গাহৃদিদের প্যাশন। গঙ্গাহৃদি কারিগরিবিদ্যার খ্যাতি পৃথিবীজোড়া। পাট, বেত, পোড়ামাটি, পিতলের ডোকরার কাজ। নৌকো ও জাহাজ বানানো। অতিসূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র উৎপন্ন হতো রাজধানীর আশেপাশেই, হয়তো আজ যেখানে ফুলিয়া-শান্তিপুর, সেখানেই। সোনার খনি ছিল লালমাটির অঞ্চলে। রাজধানী ছাড়াও আরও বহু বাণিজ্যকেন্দ্র ছড়িয়ে ছিল গোটা রাজ্য জুড়ে— মহাস্থানগড়, বাণগড়, রামাবতী, উয়ারী বটেশ্বর, চট্টগ্রম, তাম্রলিপ্ত। রাজ্যজোড়া নদীনালার এমন নেটওয়ার্ক যে, মালবাহী নৌকো সমুদ্র থেকে নদী খাল হয়ে খিড়কির দরজায় পৌঁছে যেত অনায়াসে। সেই নেটওয়ার্ক বজায় ছিল বহুদিন। শেষে ইংরেজ এসে খাল বুজিয়ে রেলপথ বানালো, মজা খালে হলো ম্যালেরিয়ার চাষ!

কার্তিক পূর্ণিমার ভোরে গঙ্গাহৃদিরা সপ্তডিঙা মধুকর পণ্যে বোঝাই করে মৌসুমি বায়ুতে পাল খাটিয়ে পাড়ি দিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে চীনে, তারপর বিপরীত মৌসুমি বায়ুতে ভর করে ঘরে ফিরে আসত জাহাজভর্তি ধনরত্ন নিয়ে। সেসব বাণিজ্যপোত পাহারা দিতে গঙ্গাহৃদি নৌসেনার অসংখ্য রণতরী, টহল দিত সপ্তসমুদ্র। চীন থেকে মহার্লিকা (ফিলিপিন্স), রোম থেকে মিশর, সব দেশের বণিকরা আসতো গঙ্গাহৃদি সমুদ্রবন্দরে। ক্রেতা-বিক্রেতাদের মনোরঞ্জনে মেলা বসত। মুখরোচক খাবারের সুগন্ধে আমোদিত হতো বাতাস। বাজিকররা খেলা দেখাতো। বন্দরগুলো থেকে জাহাজ ভর্তি করে সোনার গহনা, মণিমুক্তা, সূক্ষ্ম রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, তেজপাতা, সুগন্ধী তেল, মসলা, সুগন্ধি রপ্তানি হতো। কাপড় রাঙানোর নীল, মহিষের শিং, সোরা, চাল, ঘি, মধু। পৃথিবীর অভিজাতদের কাছে অশেষ খ্যাতি ছিল গাঙ্গেয় পণ্যসামগ্রীর।

এত সমৃদ্ধির মধ্যেও গঙ্গাহৃদিদের জীবনযাত্রা ছিল সরল। প্লেইন লিভিং, হাই থিংকিং। ঠাকুরকে পায়েস রেঁধে মানত করতো--- আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। গোবর নিকোনো মাটির দাওয়ায় বসে কলাপাতায় গরম ভাতে ঘি ঢেলে খেতো। সঙ্গে শাক, কুচোমাছ। সাজসজ্জায় ব্যবহার করত রংবেরঙের পাখির পালক ও কড়ি। টলটলে পদ্মদীঘিতে ছিপ দিয়ে মাছ ধরত। পাড়ে শেওড়া, কলা, শিমুলের বন। বাতাসে পাকা বেলের সুগন্ধ। পাতার আড়ালে বউ-কথা-কও ডাকতো। উপচে পড়া ধানের গোলা, রাঙাজবার ঝাড়। মরাইয়ে ফিঙে নাচতো। টুংটাং ঘণ্টি বাজতো গোয়ালে। কুমোরের ঘর্ঘর, তাঁতির খটাখট, কামারের ঠনাঠন। চাষির মেঠো গান, রাখালের বাঁশি, জেলের ভাটিয়ালী গান, একতারার পিড়িং পিড়িং। কথকঠাকুর বটতলায় পুঁথি পড়ছে। ভক্তরা খোল করতাল পিটিয়ে মাতৃবন্দনা গাইছে। পথের বাঁকে ঝাঁকা মাথায় বেনে হাঁক পাড়ছে— শাঁখা-পলা-লোহা, সত্ত্ব-রজঃ-তমো, তিন বালা পরলে পরে, তিন গুণ বশে হবে, ত্রিভুবনেশ্বরী মা গো...

কী, চেনা লাগছে গঙ্গাহৃদিদের?

(লেখক অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ)

বঙ্গাব্দের সূচনা করেছিলেন শশাঙ্ক

অভিমন্যু গুহ

নতুন বাঙ্গলা বছরের শুরু হতে চলেছে আর কিছুদিনের মধ্যেই। বাঙ্গালির ক্যালেন্ডারে ১৪২৮ সাল নতুন কোনও দিশা আনবে কিনা, কিংবা তার রাজনীতি-সমাজ জীবনে কোনও পরিবর্তন আনবে কিনা তা সময়ই বলবে। কিন্তু একটি কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, কে বাঙ্গালির নববর্ষের প্রবর্তক— এই প্রশ্নকে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা খোয়াব তৈরির চেষ্টা হবে। খোয়াব কেন বলছি? বিভিন্ন সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি হলে সে তো ভালো কথা। কিন্তু সেই সম্প্রীতি যদি একতরফা হয়, সম্প্রীতির মাশুল যদি শুধু হিন্দুদেরই গুনতে হয়, যেমনটা তারা গুনেছিলেন ১৯৪৬ বা ৪৭-এ এবং সেই ধারাবাহিকতা এখনও বজায় আছে। প্রশ্ন উঠবে, বাঙ্গালির বিষয় বলতে গিয়ে কেন হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গ টেনে আনছি? কারণ এই প্রবণতা আমরা বারবার দেখেছি যে, বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গে হিন্দুত্বের বিরোধের একটা 'গল্প' সুকৌশলে বাজারে ছাড়া হয়েছে। মুসলমান ঐতিহ্যের ধারা বাঙ্গালিয়ানাকে পুষ্ট করেছে, এমন ভ্রান্ত ইতিহাস সৃষ্টি করে আসলে বাঙ্গলাকে তাত্ত্বিকভাবে ভারত থেকে বিযুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙ্গালাস্তান নামক ইসলামিক অখণ্ড বঙ্গ তৈরির ছক বামৈস্লামিক ইতিহাসবিদদের প্রয়াস বহুদিনের।

এই প্রয়াসের বশবর্তী হয়েই তারা আবিষ্কার করেছেন বঙ্গাব্দের প্রচলনকারী বঙ্গাধিপতি শশাঙ্ক নন; 'মহামতি' আকবর নাকি বঙ্গাব্দের প্রচলনকর্তা। এই তত্ত্ব যে 'ইতিহাস'-এর নির্লজ্জ রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়, তা বোঝার জন্য ঐতিহাসিক না হলেও চলে। আমরা জানি, যিনি কোনও বর্ষপঞ্জির সূচনা করেন তাঁকে সেই বর্ষপঞ্জির তুল্য প্রাচীন হতে হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ১৪২৮ বঙ্গাব্দে আমরা পদার্পণ করতে চলেছি, অর্থাৎ বঙ্গাব্দের বয়স ১৪২৮ বছর। অন্যদিকে আকবরের জন্ম ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে, তিনি সিংহাসনে বসেন মাত্র ১৪ বছর বয়েসে ১৫৫৬ সালে, মৃত্যু হয় ১৬০৫ সালে, আমৃত্যু তিনি সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে আকবরের জন্ম আজ থেকে মাত্র ৪৮০ বছর আগে। যার জন্ম ৪৮০ বছর আগে, যিনি রাজ্যপাট সামলেছেন চারশো-সাড়ে চারশো বছর পূর্বে, তার প্রতিষ্ঠিত একটা ক্যালেন্ডারের বয়স কী করে, কোন ঐতিহাসিক যুক্তিতে চৌদ্দোশো বছর অতিক্রম করল তা একটা বিস্ময় বটে। অতএব ঐতিহাসিক যুক্তিতে আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা এটা ধোপে টিকছে না বুঝেই বামৈস্লামিক ঐতিহাসিকরা নতুন সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কারে মনোযোগী হন। তাঁদের নয়া থিয়োরি অনুযায়ী, আকবর নাকি বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন হিজরি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী। ইসলামের প্রাবর্তক হজরত মহম্মদ মক্কা থেকে মদিনার দিকে যে যাত্রা করেন মুসলমানরা তাকে হিজরত বলেন। এই হিজরতের স্মরণেই হিজরি বর্ষপঞ্জির সূচনা। ঐতিহাসিক মতে, ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এই যাত্রা আয়োজিত হয়। অর্থাৎ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরি বর্ষপঞ্জির অনুকরণে মোগল সম্রাট আকবর নাকি বঙ্গাব্দ চালু করেন। কিন্তু এই হিসাবও মিলছে না, এই হিসাবে চৌদ্দশো বছর (২০২২-৬৩৩=১৪০০) আগে বঙ্গাব্দের শুরু। কিন্তু বর্তমানে বঙ্গাব্দের বয়স ১৪২৮ ছুঁইছুঁই। তাহলে এই অতিরিক্ত ২৮ বছর এল কীভাবে? অতঃপর বামৈস্লামিক ইতিহাসবিদদের আবিষ্কার আকবর ইসলামি প্রথা অনুযায়ী চান্দ্রমাসের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন, সেই কারণে বঙ্গাব্দের বর্ষপূর্তি ৩৬৫ দিনে না হয়ে আরও কিছু বেশিদিনে হয়। সেই জটিল হিসেব এখানে দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এইভাবে তারা ২৮ বছরের হিসাব দিব্যি মিলিয়ে দিলেন।

মিথ্যা কথার একটা দোষ হচ্ছে, সেই মিথ্যা ঢাকার জন্য যেমন আরও একটা মিথ্যার প্রয়োজন, আবার সেই আরও একট মিথ্যা ঢাকার জন্য আরও একটা মিথ্যা— এই ভাবে মানুষ ক্রমশ মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়ে। তেমনই মিথ্যা তত্ত্বের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য। সত্য আড়াল করতে একের পর এক মনগড়া তত্ত্ব তৈরি করেও শেষরক্ষা হলো না। যদি ধরেও নেওয়া যায় চান্দ্রমাস অনুযায়ী বঙ্গাব্দের আবিষ্কার, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, জ্ঞান হওয়া থেকে আমরা দেখে আসছি

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

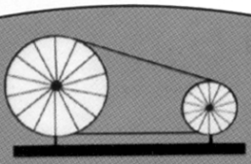

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান — দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

যে ১৪ বা ১৫ এপ্রিল বঙ্গাব্দের সূচনা হয়। একশো-দেড়শো বছর আগে ১২ বা ১৩ এপ্রিল বঙ্গাব্দের সূচনা হতো। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের লিপইয়ারকে কেন্দ্র করে অতি নগণ্যহারে বাঙ্গালা বর্ষপঞ্জির সঙ্গে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের এই দিনগত তফাত বলে ক্যালেন্ডার-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। যদি চান্দ্রমাসের থিয়োরি সঠিক হতো, তাহলে গত দেড়শো বছর ধরে আর যাই হোক একইভাবে এপ্রিল মাসের ১২ থেকে ১৫ তারিখ বাঙ্গালি নববর্ষের সূচনা হতো না। একশো বছরে এই সামান্য দিনগত ফারাক দিয়ে চৌদ্দশো বছরে যে আটাশ বছরের ব্যবধান ঘোচানো যায় না এট বুঝতে হবে।

পুকুর চুরি ধরা পড়ে যেতেই বামৈস্লামিক ঐতিহাসিকরা চিরাচরিত সম্প্রীতির গল্পে চলে গেলেন। তাদের নয়া আবিষ্কার আকবরের রাজ জ্যোতিষী ফতেউল্লাহ সিরাজি নাকি ইসলামিক চান্দ্রমাস ও হিন্দুদের সৌরমাসের সমন্বয়ে অপূর্ব বর্ষপঞ্জী বঙ্গাব্দ তৈরি করেন। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ে কি ২৮ বছরের গোঁজামিল পূরণ করা সম্ভব? উত্তর নেই। আসলে আকবরকে উদার ভারতসম্রাট-রূপে প্রতিষ্ঠা করার তোড়জোড় অনেকদিনই চলেছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না— ভারতে বহিরাগত হিন্দুবিদ্বেষী এক মুসলমান শাসককে কোন স্বার্থান্বেষী কায়েমি বন্দোবস্তের জন্য সুকৌশলে সমন্বয়কারী, হিন্দুদরদি বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে? এর মধ্যে ইতিহাসের নামগন্ধ মাত্র খোঁজার চেষ্টা করা বৃথা।

মজার ব্যাপার হলো, আকবর যে ক্যালেন্ডার চালু করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত সেই তারিখ-ই-ইলাহির সঙ্গে বঙ্গাব্দের বর্ষগণনার কিন্তু কোনও মিল নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি সমেত আকবরের কোনও প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থেও তিনি বঙ্গাব্দের প্রচলন করেছিলেন বলে উল্লেখ মাত্র নেই। আরও অনেক পাথুরে প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা নন— যেমন পশ্চিমবঙ্গের মৃন্ময়ী মাতার মন্দির ৪০৪ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে তাম্রলিপিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা হলে প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন তাম্রলিপিতে বঙ্গাব্দের উল্লেখ করা হলো কী করে?

আসলে বঙ্গাব্দের হিসেবে আকবরকে প্রতিষ্ঠিত করার মূল চক্রীরা হলেন বাংলাদেশের কিছু বুদ্ধিজীবী যেমন শামসুজ্জামান খান, সৈয়দ আশরাফ আলি, সিরাজুল ইসলাম, আহমেদ জামাল ইত্যাদি। এদের মধ্যে কেউ কেউ সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৪- ১৫১৯)-কেও বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, এই হুসেন শাহের তত্ত্ব সেভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। হতে পারে মোগল সংস্কৃতি অখণ্ড বাঙ্গলায় তো বটেই, সারা ভারতে কী কীর্তি স্থাপিত করেছে তা দেখাবার তাগিদেই আকবর বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা— এই ধরনের তত্ত্ব প্রচার। ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত তথ্য হলো, ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। সূর্যসিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়ে এই বর্ষপঞ্জি তৈরি হয়েছিল বিশুদ্ধ হিন্দুমতের সৌর-ক্যালেন্ডার মোতাবেক।

গোল বাঁধল ১৯৭১-এ বাংলাদেশ নামক একটি পৃথক দেশ তৈরি হওয়ার পর। অখণ্ড পাকিস্তানের ভেতর মুসলমানদের মধ্যেই এই মারামারি-কাটাকাটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক দুনিয়া খুব ভালোভাবে নেয়নি। 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্ম হলেও তার কয়েক বছরের মধ্যে ভেক পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণা করে একটি ইসলামি দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলাদেশের। তারপর থেকেই তারা ভেকের আড়ালে বাঙ্গালির চিরাচরিত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। বাংলাদেশের প্রাক্তন সেনাপ্রধান তথা রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল এরশাদ বাঙ্গালির ক্যালেন্ডারকে একটু অদলবদল করে কৃত্রিমভাবে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করেন, যার নাম রাখেন 'বাংলাদেশের জাতীয় বর্ষপঞ্জি'। বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের ঈদ, মহরম-সহ যাবতীয় পরব হিজরি বর্ষ অনুযায়ী পালন করে থাকে। তাহলে জাতীয় বর্ষপঞ্জি কীসের জন্য। স্মৃতিলেখা চক্রবর্তীর অনুমান, আসলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারে বাধার সৃষ্টি করার জন্যই এই চক্রান্ত। অর্থাৎ আমাদের বাঙ্গালিত্বকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে, আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, সম্পূর্ণ মনগড়া ইতিহাস পড়িয়ে। সুতরাং বাঙ্গালিকে সজাগ থাকতেই হবে। নইলে তার অস্তিত্বই সংকটগ্রস্ত হবে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা : স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং গবেষক)

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

Manufacturers of Wire and Wire Products

Office : Unit No-VII, 15th floor, Tower-I
PS Srijan Corporate Park
Plot No. G-2, Block-EP & GP, Sector-V
Salt Lake City, Kolkata-700 091
(West Bengal) India

"Om"

M/S. RAJ KUMAR BROTHERS
M/S. R. K. BROTHERS

HARDWARE MERCHANTS
COMMISSION AGENT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

STOCKIST OF :-

M.S WIRE ROD/ TMT, TATA HB, ANEALED & G.I. BARBED CONCERTINA WIRE, WIRENETTING & CHAIN LINK, WIRE NAILS, K.K. NAILS, PANEL PINS, TARFELT, BOLT NUTS & RIVETS, PLASTIC (POLYTHENE), PVC, GI, CORRUGATED SHEET, ELECTRODES & AGRICO TOOLS ETC.

167, Netaji Subhash Road, (Raja Katra), Kolkata-700 007
Ph. 22580040/41 M- 9830630343, 9830057254
email : bagariapratyush@gmail.com

কে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ?

সিউড়ির সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা আর পাঁচটা ঘরের ছেলের মতো জগন্নাথ-ও একজন। স্বামী সত্যানন্দ দেবের অমোঘ দর্শন 'ফুল সুন্দর হওয়ার' পাঠ পেয়েছেন সিউড়ি রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ থেকে। ভাল ছাত্র হিসাবেই পরিচিতি রয়েছে তাঁর। ছোট থেকে ভাল মানুষ হওয়ার স্বপ্ন লালন করা জগন্নাথ চেয়েছিলেন সাংবাদিক হতে। তাই সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক হলেও বদলে নেন নিজের ক্ষেত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা নিয়ে এম এ পাশ করেন। দীর্ঘ ২১ বছর সাংবাদিকতা করেছেন। আমেরিকার ইস্ট-ওয়েস্ট সেন্টার থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ফেলোশিপ করেছেন। তিনি জেফারসন ফেলো। দু'দশক সাংবাদিকতায় কাটিয়ে চাকরি ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছেন। এবার তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্য সিউড়ির সামগ্রিক উন্নয়ন এবং জেলার রাজনৈতিক ভর কেন্দ্র হিসাবে সিউড়ির গৌরব ফিরিয়ে আনা।

সিউড়ি-রাজনগর-বক্রেশ্বরের উন্নতির জন্য কী পরিকল্পনা রয়েছে জগন্নাথের—

১) দিল্লী ও কলকাতায় এক দলের সরকার মানে ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে ফের প্রান্তিক-সিউড়ি রেল প্রকল্পের জন্য ঝাঁপাবেন তিনি। কেন্দ্র-রাজ্য আধাআধি খরচেই তৈরি হবে এই নতুন রেল পথ।
২) সিউড়ি সদর হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত করা।
৩) সিউড়িতে নতুন কর্মসংস্থানমুখী জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।
৪) সিউড়ি বিধানসভা এলাকায় একটি নতুন সৈনিক স্কুল তৈরি করা।
৫) রাজনগর-বক্রেশ্বর পর্যটক সার্কিট গঠন।
৬) শিল্প তালুক গড়ে নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি।
৭) সিউড়ির পুর পরিষেবার সামগ্রিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন। শহর হিসাবে সিউড়ির প্রকৃত উন্নয়ন।
৮) সিউড়ি বিধানসভা এলাকায় সর্বত্র পরিশ্রুত বিশুদ্ধ পানীয় জল সুনিশ্চিত করা।
৯) রাজনগর এলাকায় আদিবাসী ভাইবোনদের জন্য আবাসিক মহাবিদ্যালয় (কলেজ) স্থাপন।
১০) তপশীলি জাতি (বাগদি, বাউরি, দুলে, মেটে, কাহার, মাহারা, মাল ইত্যাদি) মানুষদের শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ প্রদান।

সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সিউড়ির ছেলে

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় (তীর্থ) কে

এই চিহ্নে বোতাম টিপে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

ADVT.

বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক অবক্ষয়

প্রবীর ভট্টাচার্য

বছর সাতাশ-আটাশ আগের কথা। বঙ্গাব্দের চতুর্দশ শতবর্ষ পূর্তির আয়োজন চলছে, বাঙ্গলার একাধিক শিল্পীর সঙ্গে এক ঝাঁক বাংলাদেশের শিল্পীও কলকাতায় এসেছেন অনুষ্ঠান করতে। উদ্যোক্তাদের কণ্ঠে তখন প্রকাশ্যে শোনা গেল দুই বাঙ্গলা এক করে তোলার বার্তা। গানে, কবিতায়, বক্তৃতায় কী আবেগঘন আবেদন!

১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে দুই জার্মানি এক হয়ে যাওয়ার ঘটনা তখন বেশিরভাগ সংস্কৃতিসচেতন বাঙ্গালির মুখে মুখে। শোনা যাচ্ছিল দুই কোরিয়াও নাকি এক হয়ে যাবে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের তখন দুই বাঙ্গলার মিলনের স্বপ্নফেরি। অথচ সাম্যবাদী বিপ্লবের তখন ভগ্নদশা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বর্গ সোভিয়েত ইউনিয়ান ভেঙে টুকরো টুকরো। সাম্যবাদী কমিউনিস্টশাসিত পূর্ব জার্মানির অর্থনীতি তলানিতে, আইনের শাসন বলে কিছু নেই, মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত। দুটি জার্মানি মিশে যাওয়া মানে, পূর্ব জার্মানির লক্ষ লক্ষ নাগরিকের শুধু খেয়ে পরে বেঁচে যাওয়া নয়, বরং মানুষের মতো বেঁচে থাকারও একটা সংস্থান।

কিন্তু বাঙ্গলার দুটি অংশকে মিলিয়ে দেওয়ার গল্প একেবারেই ভিন্ন। এখানে অর্থনীতির কোনো ঘটনাই নেই, বরং আছে ইসলামি সাম্রাজ্যবাদের রাজত্ব বিস্তারের ঘৃণিত ষড়যন্ত্র। আর এই ষড়যন্ত্রে দাবার ঘুঁটির মতো অভিনয় করে চলেছে এ পারের কিছু হিন্দু বাঙ্গালি। মূল চালিকাশক্তি কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের হাতে। একটু পিছনে ফিরে তাকাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা আজকের বাংলাদেশের যে কোনো সাহিত্য পত্রিকা খুলে দেখুন, কলকাতাকে না পাওয়ার হাহাকার প্রত্যেক লেখক কবির লেখায় জ্বলজ্বল করছে। এরা ভাবতেই পারেনি, কলকাতা-সহ সম্পূর্ণ বাঙ্গলা পাকিস্তানের হাতে আসবে না! এক শ্যামাপ্রসাদের চালে সব ভণ্ডুল! স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল বিচিত্র। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি গঙ্গাধর অধিকারী 'মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের' একটি প্রস্তাব আনেন। অধিকারী থিসিসের মূল বয়ান অনুযায়ী ভারতকে তারা আঠারোটি ভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। সেই পথ ধরেই পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশী পাকিস্তান আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করেন। কমিউনিস্ট পার্টি শুধুমাত্র মুসলিম লিগের দাবি সমর্থনই করেননি, বরং তাদের লোককে মুসলিম লিগের হয়ে কাজ করতেও বলেছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনে লিগের ম্যানিফেস্টোও এরাই বানিয়ে দেয়।

এর পরের ইতিহাস মোটামোটি সকলের জানা। শ্যামাপ্রসাদের দূরদর্শিতা ও তৎকালীন মর্যাদাসম্পন্ন বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের সময়োপযোগী ব্যবস্থা নেওয়ায় সম্পূর্ণ বাঙ্গলাকে পাকিস্তানে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। এর ফলে হিন্দু বাঙ্গালি শুধুমাত্র ভারতের মূল ভূখণ্ডে থাকতে পারলো তাই শুধু নয়, আত্মসম্মানের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকারও সুযোগ পেল। সম্পূর্ণ বাঙ্গলা না পাওয়ার যন্ত্রণায় কাতর পাকপন্থীদের পরবর্তী চাল বাঙ্গালির আইডেনটিটি কেড়ে বাঙ্গালির ভাষা ও সংস্কৃতিকে শূন্য করে দেওয়া। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ছলনার মধ্যে দিয়ে এরা সেই কাজে সফল হলো। আরবি শব্দে ভরপুর একটি জগাখিচুড়ি ভাষাকে বাংলা বলে গোটা পৃথিবীর স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। এখন প্রয়োজন সম্পূর্ণ বাঙ্গলা।

আবার কাজে লেগে পড়লো কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের দল। পাঞ্জাবি আর জামদানি শাড়ির লোভে একদিকে বাংলাদেশি মানুষের সংগীত, নাটক ও কাব্যপ্রিয়তার প্রচার, অন্যদিকে উপঢৌকনের লোভে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন বাঙ্গালির ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি সব কিছুকে ভুলিয়ে সম্প্রীতি ও মিলনের গল্পে ভরপুর শিরদাঁড়াহীন এক প্রজাতি দাঁড় করানোই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ালো। ধর্মতলায় ভাষা আন্দোলনের একটি স্মারক গড়ে তোলার জন্য নয়ের দশকের শেষদিকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একটি দল গিয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে। তিনি তখন কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী। সুচতুর সন্তোষ দেব বাঙ্গালির আবেগ জানেন। তাই তিনি রাজি হয়ে যান, কিন্তু তাতে বাহান্নর পাশাপাশি বরাকের ভাষা আন্দোলনে বলিদানপ্রাপ্ত এগারো জন মানুষের ভাষার জন্য প্রাণত্যাগের বিষয়টিকেও রাখার প্রস্তাব দেন। ব্যাস, এবারে একেবারে চুপ মেরে যায় ওই বুদ্ধিজীবীর দল! মানভূম, বরাক বা দাড়িভিটে বাংলা ভাষার জন্য লড়াই হয়েছে, মানুষ প্রাণ দিয়েছে— এই সত্য প্রচার পেলে বাংলাদেশের ৫২-র ভাষা আন্দোলনের মিথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এটা ভালো করেই জানে এইসব শিরদাঁড়া-হীন বুদ্ধিজীবীর দল। অতএব চেপে যাও!

পাকিস্তানের গল্প খুব সোজা। তাদের মাটিতে বিধর্মীদের কোনো স্থান নেই। তাই পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ— নাম যাই হোক না কেন, কোটি কোটি হিন্দু বাঙ্গালি চরম অত্যাচারের শিকার হয়ে দীর্ঘ পঁচাত্তর বছর ধরে ওপার থেকে এপারে আশ্রয় নিচ্ছে। নিজেদের জমিজমা সব হারিয়ে এপারে চরম দুর্দশায় রেল লাইনের ধারে, স্টেশনে, রাস্তায়, পাইপের ভিতরে, সাপ, কুমির আর বাঘের ভয়কে তুচ্ছ করে জলে জঙ্গলে বসতি গড়ে তুলেছে।

না! বাঙ্গালির সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক, কবিতা, গান বা খবরের কাগজে কোথাও এই কঠিন বাস্তবের কোনো প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেনি! বরং দীর্ঘ কয়েক দশকে বাম শাসিত বঙ্গ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এমনএক প্রেক্ষাপটে যাতে মনে হয়, এইতো হওয়া উচিত ছিল! ভিটে মাটি হারানো মানুষের উচ্ছেদ--- নোবেল পুরস্কারপ্রাপক বামপন্থী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে ভূমিহীন মানুষের লড়াই। দেড় হাজার বছরের প্রাচীন বাঙ্গালির গর্বের কাল পঞ্জিকাকে অস্বীকার করে 'বঙ্গাব্দ'-কে তিনি অবলীলায় সম্রাট আকবরের বলে চালিয়ে দেন! মিথ্যার বেসাতি করা এক বাজারি পত্রিকা যা না পড়লে নাকি মানুষ পিছিয়ে পড়ে, তাতে ফলাও করে কিস্তির পর কিস্তি আকবরের পক্ষে প্রমাণ হাজির হতে থাকে। এখানেই শেষ নয়। যাত্রা, থিয়েটার, নাটক, সিনেমা সর্বত্র হিন্দু সমাজ কত খারাপ এবং পাশাপাশি উদার, মানবিক ও শান্তির বাণী নিয়ে কীভাবে ইসলাম হাজির হয়েছে তার শতশত কাহিনি উজাড় করে দিয়েছে এই পাঁচ ছয় দশকের কমিউনিস্ট শাসকের বাঙ্গলা (মমতা ব্যানার্জির সরকারও প্রকারন্তরে অষ্টম বামফ্রন্ট)।

একটি উদাহরণ দিই। যাত্রার নাম 'দেবী সুলতানা'। দেখানো হচ্ছে এক হিন্দু মহিলা, নাম দেবী। তাকে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পতিতা বলে সমাজচ্যুত করলে মুর্শিদকুলি তাকে বেটি বলে সাদরে আপ্যায়ন করে ও চূড়ান্ত অবমাননার হাত থেকে রক্ষ করে। এক ধাক্কয় দুই পাখি বধ। হিন্দু ধর্মের মুণ্ডপাত ও ইসলামের মহানুভবতা। এমন মানবিক উদার ধর্মের কাহিনি এবং পাশাপাশি লোভী, ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল এবং অজ্ঞানতায় ভরপুর হিন্দু সমাজের কাহিনি শোনানো হয়নি বা শোনেননি, গত পাঁচ ছ' দশকে এমন বাঙ্গালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদের ভুরি ভুরি নিন্দা এবং সিরাজোউদ্দৌল্লা, টিপু সুলতান, তিতুমিরের মতো চরিত্রগুলিকে ইতিহাসে মহানুভব করে তোলার ট্র্যাডিশন এই বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গে বছরের পর বছর চলেছে। 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুমের' জয়গানে উদ্দীপ্ত বাঙ্গালি প্রশ্ন তোলেনি কখনো এই মিলনের গান শুধু এপার বাঙ্গলার জন্যই কেন প্রযোজ্য?

সুনন্দ সান্যাল ও সৌম্য বসু তাঁদের, 'The Sickle and the Crescent' গ্রন্থে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লিগের সহযোগিতার বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে ১৩ আগস্ট কমিউনিস্ট নেতা অমর মুখার্জি ও মংরু টাটোয়া বালির একটি জুটমিলের গেটে আয়োজিত সভায় শ্রমিক এবং বালির হপ্তাবাজারের দোকানদারদের হুমকি দিয়ে ১৬ আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এ যোগ দিতে বাধ্য করেন (আশা করি পাঠককুল ১৬ আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে জানেন)। মহম্মদ ইসমাইল ট্রাম কোম্পানির নেতা, তিনি ইউনিয়ানের সভ্যদের বলেন, যে করেই হোক ১৬ আগস্টের হরতাল সফল করতেই হবে। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'-তে ষোলো আগস্ট হিন্দুদের কাছে আবেদন করা হয়, 'মুসলিম লিগ নেতারা যাই বলুন, মুসলিমেরা কতটা ব্রিটিশবিরোধী আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। অতএব এই দিন যদি কোনো বিপথগামী মুসলমান ঝোঁকের বশে কিছু একটা করে বসে, তবে তাকে আপনারা ভাইয়ের একটা ভুল বলেই মেনে নেবেন।'

ঝোঁকের বশে এইরকম একটি ভুল করে ফেলেছিলেন কমিউনিস্ট নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ ফারুকি। বন্দর এলাকার মুসলমান বস্তির মধ্যে লিচু বাগানে তিনশো হতভাগ্য ওড়িয়াকে পনেরো মিনিটের মধ্যে কচুকাটা করে ফলে। ফারুকির নেতৃত্বে সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান ভাইয়েরা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। সিপিআই অবশ্য ভাইয়ের এই ভুল ক্ষমা করে তাকে টিকিট দিয়ে বিধায়ক করে দেয়।

কলকাতা শহর এবং পরে নোয়াখালি-সহ পুর্ব বাঙ্গলার সর্বত্র ঘটে যাওয়া এই বাঙ্গালি হিন্দু গণহত্যার কাহিনি ইতিহাসে কোথাও স্থান পায়নি। ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস। আর এই কাজে পারদর্শিতার সঙ্গে শয়ে শয়ে শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করে বাম রাজনীতিবিদেরা গঙ্গাধর অধিকারী, পি সি যোশীর পথেই হেঁটে চলেছে।

কী বলবেন, ঐতিহাসিক ভুল? মোটেই না। ক্রমাগতভাবে পরের হাতে তামাক খেতে অভ্যস্ত বামপন্থী রাজনীতিবিদদের নয়া অবদান ফুরফুরা শরিফের মহান পিরজাদা আব্বাস উদ্দিনের কেরামতি দেখানো! অধৈর্য হবেন না, অচিরেই শুনতে পাবেন, ধর্মনিরপেক্ষ, শান্তির পায়রা, প্রগতির দূত, বাঙ্গালির অগতির গতি আব্বাস ভাইয়ের সেবা লাগি-ই-ই-ই!

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং গবেষক)

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

বোলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে

ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী

ড: অনির্বাণ গাঙ্গুলি-কে

বিজেপি

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

প্রার্থী পরিচিতি

ড: অনির্বাণ গাঙ্গুলি— এই নামটা কয়েকদিন আগেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল। সম্পূর্ণ উচ্চশিক্ষার জগৎ থেকে তিনিই এবার সোজা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বোলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী।

অত্যন্ত গৌরবময় পারিবারিক উত্তরাধিকার জন্মসূত্রে পেয়েছেন অনির্বাণবাবু। অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী, ঋষি অরবিন্দের সহযোদ্ধা বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক। তাঁর ঠাকুরদাদা ছিলেন কল্লোল যুগের অন্যতম কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাংস্কৃতিকসূত্রে ছোটবেলায় মাত্র তিনবছর বয়সেই চলে গিয়েছিলেন পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। প্রখ্যাত দার্শনিক ও ভারততত্ত্ববিদ ঋষি অরবিন্দের স্নেহধন্য নলিনী গুপ্তের হাতেই তাঁর শিক্ষার শুভারম্ভ। সেই আশ্রমেই সান্নিধ্য পেয়েছিলেন রবীন্দ্র স্নেহধন্যা সাহানাদেবীর। যার কাছ থেকে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, নন্দলাল বসুদের ভারতচিন্তা ও স্বদেশসেবার কথা। ঠাকুমার হাত ধরেই বহুবার এসেছেন এই শান্তিনিকেতনে, পেয়েছেন রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সহ একাধিক স্বদেশব্রতী সারস্বত ব্যক্তিদের সান্নিধ্য। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে স্নাতকোত্তর, গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষায় তিনি পি এইচ ডি। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে ইউনেস্কো, সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে অরোভিল ফাউন্ডেশন, বিশ্বভারতী সংসদ কোর্ট থেকে নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ইত্যাদি নানা গৌরবময় পদ অলংকৃত করেছেন। 'অমিত শাহ অ্যান্ড দ্য মার্চ অফ বিজেপি', 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি : হিজ ভিশন অফ এডুকেশন', 'এডুকেশন : ফিলজফি অ্যান্ড প্র্যাকটিস', 'স্বামী বিবেকানন্দ, বুদ্ধ অ্যান্ড বুদ্ধিজম'-এর মতো একাধিক গ্রন্থের রচয়িতা এই গুণী মানুষটি। সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় জনতা পার্টির 'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশন' নামক একটি থিঙ্ক ট্যাংকের অধিকর্তা পদে কর্মরত।

ADVT.

রাজনীতির বিষে মৃতপ্রায় বাঙ্গলার সংস্কৃতি

সুজিত রায়

এই প্রতিবেদনের মূল চরিত্র দুটি— বঙ্গ সংস্কৃতি ও বঙ্গ রাজনীতি। তাই তৃতীয় কোনো চরিত্রের অনুসন্ধান বৃথা। আরও একটা কথা— এই প্রতিবেদক কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর গণশত্রু নন, তল্পিবাহকও নন। তাই এই প্রতিবেদন থেকে সংকীর্ণ কোনও অর্থ খুঁজে বার করার চেষ্টাও হবে নিরর্থক।

বঙ্গ সংস্কৃতির পর্দা ঠেলে অন্দরমহলে ঢুকে পড়ার আগে সংস্কৃতি নামক এই ভারী শব্দটির সম্পর্কে একটু চর্চা সেরে নেওয়া যাক। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড বি টাইলর সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এই বলে যে, 'Culture is a complex whole that includes knowledge, belief, art, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.' অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো সামগ্রিক ভাবে মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন, প্রথা এবং যাবতীয় যোগ্যতা ও অভ্যাসের সমন্বিত ফলাফল। আবার ক্লাইভ ক্লাকোহন এবং রেমন্ড কেলি বলেছেন, 'সংস্কৃতি হলো'— historically created selective processes which channel man's reaction both to internal and external stimuli.' যার অর্থ হলো, সংস্কৃতি একটি ইতিহাসাশ্রয়ী নির্বাচিত পদ্ধতি যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উদ্দীপক প্রসঙ্গে মানুষের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ রবার্ট বিয়েরসটেডট আরও একটু সহজ ভাবে বলেছেন, 'Culture is the camplex whole that consists of all the ways we think and do and everything we have as members of the society. It includes all the ways of living and doing and thinking that have been passed down from our generation to another and that becomes an accepted part of the society.' অর্থাৎ

একি ক্ষমতা ? নাকি ক্ষমতার অপব্যবহার ? একি পরিবর্তন ? নাকি অধঃপতন ?

সংস্কৃতি হলো সমাজের মানুষ সামাজিক সদস্য হিসেবে যা কিছু করে থাকে তার সামগ্রিক পরিচয়। জীবনযাত্রার সর্ববিধ উপায় এবং যা সমাজে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয়, তাই-ই হলো সংস্কৃতি।

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে জীবনচর্যাই যখন সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তখন নিতান্তই এক বঙ্গসন্তান বাঙ্গালি ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় কিন্তু স্বল্প শব্দব্যয়ে সংস্কৃতি শব্দটির রূপটান এঁকে ফেলেছেন। তাঁর মতে, 'কৃষিকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বীজের সংস্কারসাধন, তার গুণগত পরিবর্তন ঘটানো। এই গুণগত পরিবর্তনই হলো সংস্কৃতি।' এই সংস্কৃতিই জন্ম দেয় উপসংস্কৃতি এবং গণ সংস্কৃতির।

আমাদের বিষয় বঙ্গ সংস্কৃতি। ওপারের নয়। এ পারের। এই সংস্কৃতির জন্ম ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি থেকে যা ঐতিহ্যময় ও ইতিহাসাশ্রয়ী। নিজস্ব ঐতিহ্য এবং নিজস্ব বৈভবে বিভোর। এই সংস্কৃতির মূল লক্ষণগুলি হলো : (১) মানবিকতা, (২) মূল্যবোধ, (৩) পারস্পরিক সম্মানদান, (৪) আত্মসম্মান বজায় রাখা, (৫) সততা, (৬) সামাজিকতা, (৭) বিচারবোধ, (৮) সাহসিকতা, (৯) অভিমান, (১০) সাংস্কৃতিক বিনিময় চর্চায় আগ্রহ। এছাড়াও আছে শালীন আচরণ, সুঅভ্যাস, আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিজ্ঞানসম্মত টান, অতিথি সৎকার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, স্বাধীনতা রক্ষা ইত্যাদি। এই সমস্ত লক্ষণ ফুটে ওঠে তিনটি পর্যায়ে : (১) পারিবারিক পর্যায়ে, (২) সামাজিক পর্যায়ে, (৩) রাজনৈতিক পর্যায়ে।

আমাদের ওই প্রবন্ধের মূল বিষয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি বলতে শুধু রাজ্য-রাজনীতির সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির সংস্কৃতি বোঝায় না। যে রাজনীতির কথা বলতে চাইছি তা হলো--- নীতির রাজা বা নৈতিক রাজনীতি। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, রাজনীতি হলো এক অতি উন্নত মানের বিজ্ঞান। 'Politics is Master Science that is nothing less than the activity through which buman leeings attempt to improve their lives and create the good society.'

অর্থাৎ রাজনীতি হলো সব ধরনের কর্মসূচি যা মানবিক জীবনের মানোন্নয়ন ঘটায় এবং একটি ভালো সমাজ সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের সূত্র ধরেই। অর্থাৎ 'ভালো সমাজ' গঠনের জন্য যে কর্মসূচি রাজনীতি বলে স্বীকৃত সেই কমসূচি নিয়ে প্রতিপক্ষের মতামত, চাহিদার বিভিন্নতা, প্রতিযোগীসুলভ প্রয়োজনীয়তা এবং পরস্পর বিরোধী স্বার্থ থেকে সৃষ্টি যে দ্বন্দ্ব যার মূল লক্ষ্য

থাকে সেই সব সূত্র যা মানুষের জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করে। আবার অন্যদিকে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ মনে করে যে, ওই সূত্রগুলিকে প্রভাবিত করতে হলে অথবা চালু রাখতে হলে পরস্পরের হাত মিলিয়ে চলা দরকার।

এখান থেকেই চলুন ঢুকে পড়ি মূল বিষয়ে— বঙ্গ সংস্কৃতি ধর্ষিতা, ধর্ষক বঙ্গ রাজনীতি।

যদি বলি বহু ভারতীয় সংস্কৃতি পূর্ণতা পেয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতির হাত ধরে তাহলে বোধহয় খুব ভুল বলা হবে না। কারণ বঙ্গ সংস্কৃতি হলো কুলীন সংস্কৃতি। নেতিবাচক অর্থে নয়। ঐতিহাসিক এবং বিজ্ঞানমনস্ক অর্থে। এ সংস্কৃতি বাঁচতে জানে, বাঁচাতে জানে। ইজমের বিরোধিতা আছে। কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো হাত ধরাধরি করে ছুটে চলা স্রোতও আছে। বাঙ্গলি সমাজে ঠাকুরদার ঝুলির সম্মান আছে, চাণক্যের শ্লোকেরও সম্মান আছে। এ সমাজে বিনয় বাদল-দীনেশ আছে, অতীশ দীপঙ্কর আছে। এই সমাজ এই সংস্কৃতি প্রয়োজনে এক হাতে ধরে তরোয়াল, অন্য হাতে রুদ্রাক্ষের মালা।

অন্তত ৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গ সংস্কৃতি ছিল এতটাই মুখর। কিন্তু যেদিন থেকে রাজনীতি দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের নীতি ভেঙে শুধু দ্বন্দ্বের কুশীলব হয়ে উঠেছে এ বঙ্গ, সেদিন থেকে বঙ্গরাজনীতির অঙ্গনে বঙ্গসংস্কৃতির কালো যুগ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত রাজনীতির গতিপথ ছিল একরকম। তখন বিরোধিতা থাকলেও জ্যোতি বসু ও বিধান রায়ের মধ্যে মুখদর্শন, আলাপ- আলোচনা, ঠাট্টা, চুটকি সবই চলত। রাজনীতি সীমাবদ্ধ ছিল ব্যালট বক্সে। ১৯৬৭-৭০-এর যুগলমিলনে প্রথম দেখা গেল রাজনীতির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু হয়েছে এবং তা আঘাত হানছে সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোয়। এই সময়েই একদিকে যেমন মাসলম্যানদের দৌরাত্ম্য চোখে পড়েছে তেমনি চোখে পড়েছে গান্ধীবাদী প্রফুল্ল ঘোষের মাথায় কালির দোয়াত ঢেলে দিয়ে নতুন বাম রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া। যদিও এ ঘটনার আগেই ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট জমানার রণদামামা বাজার আগেই বামেরা গোটা রাজ্য মুড়ে দিয়েছিল কানা বেগুন আর কাঁচকলাতে কারণ রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষের এক চোখ ছিল কানা আর মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন চালের অভাবে কাঁচকলা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বঙ্গ সংস্কৃতির অধঃপতনের দিন শুরু হলো এবং তা বঙ্গ রাজনীতির হাত ধরেই।

১৯৬৭-৭০ ছিল বাঙ্গলার সংস্কৃতিতে এক চরম রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার সময়। পরপর দুবার সাংবিধানিক সংকটে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন এবং পুরোপুরি ছাপ্পা ভোটে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের রাজ্যের ক্ষমতা দখল— সবটাই ছিল সাংস্কৃতিক অবনমনের নমুনা। তার ওপর ছিল ধ্বংসাত্মক নকশালপন্থী রাজনীতি যা বাঙ্গলার রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের কোমর ভেঙে দিতে উদ্যত হয়েছিল। কংগ্রেস যেমন ছাপ্পা রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল, তেমনই নকশালরা চেয়েছিলেন সব সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিয়ে এক নয়া সংস্কৃতির কল্পরাজ্য গঠন করা। অতিবাম রাজনীতির যে জটিল ব্যাখ্যা নকশালপন্থীরা দিতেন তার তাত্ত্বিকতার মধ্যে না ঢুকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাটা এরকমই দাঁড়ায় এবং সমতুল স্লোগানটি হয়ে ওঠে, 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' বা 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান', বোঝাই যায়, ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরা ভুলে তাদের কাছে আদর্শ ও নীতি হয়ে উঠেছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাওবাদ যাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও তাঁদের দেশের মাটিতে অহেতুক আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি। আসলে রাজনীতিটা ছিল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার নামে মানুষ খুনের রাজনীতি। চরম অসহনশীলতার রাজনৈতিক সংস্কৃতি অতি বামপন্থীদের অলীক সাম্যবাদের কল্পনাকেও গুঁড়িয়ে দিয়ে রাজ্যটাকে পিছিয়ে দিয়েছিল অনেকটাই। সিদ্ধার্থশংকর রায় সেই সুযোগে নকশালদের টুঁটি টিপে মারল আর জীবিত নকশালরা ভাগ হয়ে গেলেন ১৮টা গোষ্ঠীতে। সবাই নেতা। কর্মী কারা বোঝা গেল না। বোঝা গেল যা, তা হলো, রাজনৈতিক আন্দোলন না হয়ে নকশাল আন্দোলন যদি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হতো তাহলে হয়তো একটা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটতে পারত। তা হয়নি। বদলে এল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারী রাজনীতি— '৭৫-এর জরুরি অবস্থা। তারই রেশ ধরে বাঙ্গলায় '৭৭-এর শুরু হলো বামফ্রন্টের ইনিংস। উবে গেল নেহরুভিয়ান সোশ্যালিজম, গান্ধীবাদ কিংবা চরমপন্থী মাওবাদ। হঠাৎ করেই বঙ্গ সংস্কৃতিতে জাঁকিয়ে বসল মার্কসবাদ, লেনিনবাদ। প্রোলেতারিয়েত পলিটিক্স। ভূমিসংস্কার, জোতদার, প্রান্তিক চাষি, ভাগচাষি ইত্যাদি শব্দগুলো বাঙ্গালির কণ্ঠে এবং মননে গভীরভাবে প্রোথিত করা হলো। শ্রেণীবৈষম্য ঘোচানোর নামে চেনানো হলো— তুমি যে বাড়িতে বাস কর, তার পাশের বাড়ির প্রতিবেশী তোমার খুড়ো বা জ্যাঠা নয়। তিনি আসলে শ্রমিক। তোমার বাবা একজন ভাগচাষি। তুমি ভাগচাষির সন্তান। আর তুমি খেলছ একজন জোতদার, জমিদারের সন্তানের সঙ্গে। ওরা তোমার শ্রেণীশত্রু।

যে বাঙ্গালি শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ে বসে কবিতা লিখত, সেই বঙ্গসন্তানরা নতুন করে শত্রু চিনতে শুরু করল। ফলে মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, সাম্যবাদের গভীর তত্ত্বকথার খেই হারিয়ে ফেললেও পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয়ে গেল মার্কসবাদের নয়া প্রহরীদের উদ্দামতা। এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের খুনসুটি। বহু মধ্যবিত্তের মাথাতেও বামবাদীদের ডান্ডা পড়ল না বুঝেই। লাল পতাকা সেই রক্তেই ভিজে আরও লাল হলো। মার্কসবাদী কবির কলমে লেখা হলো নয়াভাষ্যে কবিতা— 'সূর্যোদয়'।

সেই সূর্যোদয়ের প্রথম ১৫টা বছর তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশা জেগেছিল। কিন্তু তারপর সূর্যোদয়ের আলো মুছতে শুরু হলো। ঠিকাদার রাজ, সিন্ডিকেটরাজ, মস্তানরাজ, তোলাবাজ রাজ প্রভৃতি গিলে খেলো বঙ্গ রাজনীতিকে। কংগ্রেস তরমুজের চেহারা নিয়ে শীতঘুমে চলে গেল। স্টালিনি কায়দায় বামপন্থী সন্ত্রাস গণতন্ত্রের চিহ্নমাত্র বজায় রাখল না। টানা ৩৪ বছর ধরে যা চলল, তা অপশাসন ছাড়া আর কিছুই নয়। শেষ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চেষ্টা করেছিলেন একটু অন্য পথে হেঁটে কিছু করার। দল করতে দেয়েনি। কবি, সাহিত্যিক বুদ্ধদেবের জোর করে কিছু করার মতো কোমরের জোরও ততটা ছিল না।

এরকম পরিস্থিতিতেই বঙ্গ রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক নতুন আইকনের প্রবেশ। সাঁইবাড়ি হত্যা থেকে অনাহারী আমলাশোল— অত্যাচারিত বাঙ্গালির রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনও বোঝা যায়নি, একদিন তিনি তস্করের ভূমিকা নেবেন। তাঁর রাজনীতিতে কোনো তত্ত্ব নেই। তিনি গান্ধীর উক্তি বলেন আবার কার্যক্ষেত্রে বামেদের কপিক্যাটের ভূমিকা নেন। তিনি

গড়গড় করে ভুল হিন্দি বলেন, ভুল ইংরেজি বলেন, ভুল ইতিহাস বলেন। আবার ভুল সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে হিন্দু হিসেবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেন যদিও হিজাবের আড়ালে সংখ্যালঘু মহল্লায় তাঁর নমাজ পড়ার নাটক করতেও কোনো সংকোচ হয় না। তিনি মিথ্যা বলেন, তিনি মস্তানদের 'কন্ট্রোল' করেন, আমলাদের ক্রীতদাস করে তোলেন। দলীয় নেতাদের সঙ্গে কৃমিকীটের মতো আচরণ করেন, ফোঁস করলেই মাথায় চাঁটি মারেন, পুলিশকে দলদাসে পরিণত করেন আবার দাবি করেন, তিনিই সৎ, তিনিই গর্ব, তিনিই বাঙ্গলার একমাত্র সাচ্চা মেয়ে যাকে নাকি বাঙ্গলা চায়।

গোটা বাঙ্গলার রাজনীতিতে অজস্র বড়দা, মেজদা, ছোড়দা গজালেও 'দিদি' গজিয়েছেন একজনই। তিনি হলেন বাঙ্গলার নয়া সংস্কৃতির নয়া আইকন— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চড়া দামের সুতির সাদা শাড়ি পরেন। 'আডিডাস' মার্কা সাদা হাওয়াই চটি পরেন। মুড়ি আর আলুর চপ খেয়ে কাটাতে পারেন দিন। হাঁটতে পারেন ১২ কিলোমিটার। আবার তিনিই রাজ্যে চপশিল্পকে ভবিষ্যৎ করতে চান। রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রেলমন্ত্রী হতে পারেন, আবার স্বার্থ ফুরোলে বিজেপির প্রধানমন্ত্রীকেই কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরাবেন বলে শাসান।

বাঙ্গালি মমতার বক্তব্য শোনে। মানে কম। বিশ্বাস করে কম। তবু ভোট পান। ব্রিগেডে ভিড়ও হয়। 'মানুষের ভোটে বামফ্রন্ট জিতত না'— এই সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষ ২০১১-য় তাঁকেই ক্ষমতায় আনেন। কিন্তু তখন জানা ছিল না— এই মমতাই একদিন ডাক দেবেন, রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করে দেবার। এমন এক রাজনৈতিক আইকনের ভয়েই ভীত হয়ে বামেরা বাঙ্গলার রাজনীতিতে কটূক্তি প্রয়োগের চরমতম নিদর্শন রাখতে শুরু করে। কিন্তু মমতাকে কেনার কোনো চেষ্টা করেনি। কারণ বামেরা মমতাকে কিনতেই চায়নি। অবিক্রয়যোগ্য মমতা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামে মেকি জনআন্দোলন গড়ে তুলে রাজ্য থেকে টাটাদের নির্মীয়মান কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়ে, কেমিক্যাল হাবের সম্ভাবনার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে ২০১১-য় মহাকরণে প্রবেশ করলেন সাড়ম্বরে বামেদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে। মমতার মানুষকে ভুল বোঝানোর রাজনীতি সেদিন জয়ী হয়েছিল

এ কোন বাঙ্গলাকে, বাঙ্গলার মাকে মা-মাটি-মানুষের রঙে ছোপানো আঁচলে ঢাকছি? বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্ব কি শেষ পর্যন্ত বিপন্নতার ভারে ন্যুব্ধ হয়েই থাকবে? বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি কি হারিয়ে যাবে তেপান্তরের মাঠে? আজন্ম পালিত বাংলা ভাষার গর্বকে ধীরে ধীরে ঠেলে দেবে কবরের দিকে?

একটাই কারণে। তা হলো ৩৪ বছরের বৃদ্ধ বামফ্রন্টের আফিম-বুঁদ খোয়াবি রাজনীতি সুযোগসন্ধানী রাজনীতি ছাড়া আর কিছু ছিল না। ফলে পরিবর্তনের আওয়াজ তুলে নিজস্ব রাজনৈতিক ঘরানায় উন্নয়নের শিকড়ে ঘা মেরে, রাজ্যের মানুষকে ঘুষোন্নয়নের নেশায় মাতিয়ে অভাগী ভিখিরি বানিয়ে, কালীঘাটের কলতলার ঝগড়ায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে টেনে এনে পরপর দুবার হেসেখেলে জিতে গেছেন। যতবার জিতেছেন, ততবার গলা চড়েছে। যতবার জিতেছেন, ততবার নিজস্ব ধান্দায় যেমন নিজের ব্যাক্তিগত/পারিবারিক সম্পত্তি বাড়িয়েছেন, তেমনি সংখ্যালঘু থেকে সংখ্যাগুরু সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন রাজকোষের নগদ অর্থ। যত দিয়েছেন ততই বেড়েছে ঋণের বোঝা। এখন ঋণ পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা। প্রতিটা বঙ্গবাসী ৫০ হাজার টাকা দেনায় বিধ্বস্ত।

কিন্তু লক্ষণীয়, দিদির আমলেই মাওবাদীরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে মন্ত্রী হয়েছেন, সাদা সালোয়ার-কামিজ পরে রাজ্যসভার সদস্য হয়েছে। আবার মাওনেতা কিষেনজিকে এই দিদিই গুলি করে মেরেছেন। ঘরবন্দি করেছেন শিক্ষিতা মাওনেত্রী সুচিত্রা মাহাতোকে। এই দিদির আমলেই বাঙ্গলায় সাংবাদিকতার কবর খোঁড়া হয়েছে। একশ্রেণীর সাংবাদিক পরিণত হয়েছে দালালে। তাদের বেনামা সম্পত্তির পরিমাণ কোটি কোটি টাকা। এই দিদির অনুপ্রেরণা ছাড়া বাঙ্গলার কোনো কাজ হয় না। কারণ বঙ্গরাজনীতি আজ শিখিয়েছে, বাঙ্গলার মণীষীরা কেউ অনুপ্রেরণা হতে পারেন না। শিল্প নেই, চাকরি নেই, শিক্ষা নেই। স্বাস্থ্যের নামে আছে ভাঁওতা। আইনের নামে আছে প্রহসন। আর রাজ করছে মুখ্যমন্ত্রী মমতার মুখের ধৈর্যের বাঁধভাঙা বস্তির ভাষা। তিনি এখন গোটা ভোট প্রচার করছেন বাঙ্গালির মুখের সামনে বাম পা তুলে ধরে। আর মুখে বলছেন— এই ভাঙা পায়েই এমন দেব না, বুঝতে পারবেন। সংসদীয় ভাষার কোনো ব্যবহারই এরাজ্যে নিষিদ্ধ। তবুও এ রাজ্যে সেই হাস্যকর ফ্যাসিস্ট মুখ্যমন্ত্রীই সোশ্যাল মিডিয়ায় সবচেয়ে বড়ো হাসির খোরাক। এ রাজ্যে ট্রাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্রসংগীত বাজে। আবার তৃণমূলি সাংস্কৃতিক মঞ্চে ঝিঙ্কুমণিদের সঙ্গে চটুলগানে পা মেলায় সত্তরোর্ধ নেতৃত্বও। এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পেয়াদা বীরভূমের মাটিতে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে 'চড়াম চড়াম' ঢাকের বাদ্যি তোলার হুমকি দেন। শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়ে তাঁর গোঁসা হয়। দিদি ভাইয়ের দোষ দেখেন না। ভাইপোর দোষ দেখেন না। দলকে দলীয় নেতৃত্বের হাতে না দিয়ে সঁপে দেন কর্পোরেট সংস্থার হাতে। রাজনীতি হয়ে যায় ব্যবসায়িক কোম্পানি।

একি ক্ষমতা? নাকি ক্ষমতার অপব্যবহার? একি পরিবর্তন? নাকি অধঃপতন? কিন্তু নতুন ভোরের আলো কোথায়? অমানিশার আঁধারে পশ্চিমবঙ্গকে চেনা যাচ্ছে না যে! কোথায় গেল শিক্ষার আলো? চেতনার আলো? সংস্কৃতির আলো? মানবিকতার আলো? স্বাধীনতার আলো? এ কোন বাঙ্গলাকে, বাঙ্গলার মাকে মা-মাটি-মানুষের রঙে ছোপানো আঁচলে ঢাকছি? বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্ব কি শেষ পর্যন্ত বিপন্নতার ভারে ন্যুব্ধ হয়েই থাকবে? বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি কি হারিয়ে যাবে তেপান্তরের মাঠে? আজন্ম পালিত বাংলা ভাষার গর্বকে ধীরে ধীরে ঠেলে দেবে কবরের দিকে?

শেষ কথা বলে ইতিহাস। বাঙ্গালি অপেক্ষমান সেই শেষ কথা শোনার জন্য। হয়তো সে কথা হবে অ্যারিস্টটলের বাণীরই প্রতিফলন— 'Politic is a Master Science that in nothing less than the activity through which human beings attempt to inprove their lives and create the Good Society.'

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক)

প্রার্থী পরিচিতি :—

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি এক মধ্যবিত্ত ছাপোষা পরিবারে জন্ম। সাহাপুরের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। এরপর রিজিওনাল কলেজ অফ ম্যানেজমেন্ট থেকে স্নাতকোত্তর এবং তৎসহ এস. এ. পি. সার্টিফায়েড। ২০১২ সালে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও সংস্কৃতি ত্বরান্বিত করার কাজে।

রাজারহাট নিউটাউন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় খেটেখাওয়া মানুষের কল্যাণার্থে নিজের কষ্টার্জিত অর্থে গড়ে তোলেন মানবিক সংগঠন 'অধিকার'। আজও নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

অঙ্গীকার :—

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ। কর্ম সংস্থান।

ADVT

১লা বৈশাখের ভাবনা

সত্যকাম রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'নববর্ষ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অহোরাত্রান্যার্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি', অর্থাৎ 'যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া দিন ও রাত্রি, পক্ষ ও মাস, ঋতু ও সংবৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম— তুমি আনন্দিত হও, তুমি বর লাভ করো। প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক।' নববর্ষ বাঙ্গালির জীবনে নতুন অভিষেকের দিন, নতুন করে শুরু করার দিন। পুরাতন বৎসরের জীর্ণতা, ক্লান্তি ধুয়েমুছে নতুনকে আবাহনের দিন। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, 'ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গলশঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি— সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহংকার হইতে, স্বার্থ হইতে, বিলাস হইতে, প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে— তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।' রবীন্দ্রনাথ নববর্ষের আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন ওই প্রবন্ধে।

বাংলা নববর্ষ কী, কবে থেকেই বা তার সূচনা হয়েছে, তার ঐতিহাসিক পটভূমিকাই-বা কী? এখন আমরা তা একটু আলোচনা করে নিতে পারি। বাংলা ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকার প্রথম দিনটিই হলো বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ। ইংরেজি হিসেবে ধরলে সাধারণত দিনটি ১৪ বা ১৫ এপ্রিলে পড়ে। দিনটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বাঙ্গালি অধিবাসীরা পালন করে থাকে তাঁদের চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী। এই উৎসব বাঙ্গালি ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলা সৌর পঞ্জিকা অনুযায়ী বাংলা বছরের প্রথম মাস বৈশাখের প্রথম দিনটিই নববর্ষ। ওই একই দিনে ভারতের অন্যত্র এই উৎসব পঞ্জাবে বৈশাখী, কেরলে বিশু, তামিলনাড়ুতে পুথান্দু নামে পরিচিত।

বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ পালনের সঙ্গে বাঙ্গলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙ্গালিরা এই দিন শুরু করেন প্রত্যুষে স্নান করে। এই দিনে ব্যবসায়ীরা নতুন খাতার শুভ মহরত করেন। পুরানো হিসাবপত্র মিটিয়ে নতুন বছরের শুরুর দিনে নতুন হিসেবের খাতা শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা যে চিঠি বা নিমন্ত্রণপত্র ছাপান তাতে থাকে গণেশের ছবি, মঙ্গলঘট, স্বস্তিকা চিহ্ন ইত্যাদি। লালশালুতে মোড়া সেই খাতা নিয়ে সকালে ব্যবসায়ীরা প্রথমে পূজা দেন লক্ষ্মী ও গণেশের। নতুন খাতার মহরত হয়। খাতার উপরে সিঁদুরে ডোবানো মুদ্রার ছাপ লাগানো হয়। পুরোহিত পূজা দেন। ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত গ্রাহকেরা আসেন দোকানে, তাঁদের মিষ্টিমুখ করানো হয়, নতুন খাতা খোলা হয় তাঁদের নামে। এভাবেই ব্যবসায়ীরা বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ পালন করেন। সাধারণ মানুষ এই দিনে মন্দিরে পূজা দেন। ক্লাব বা সমিতি এই দিনে সকালে প্রভাতফেরি বার করে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামে শোভাযাত্রাও বার করা হচ্ছে। আর এই মঙ্গল শোভাযাত্রা সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়েছে এই বাঙ্গলার কোথাও কোথাও; বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায়। এই জেলাতে বাংলাদেশের তথাকথিত সংস্কৃতি আমদানি করার এক সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এই মঙ্গল শোভাযাত্রা বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ ছিল না কোনোদিনই। বাংলাদেশ বাংলা নববর্ষের চিরাচরিত ঐতিহ্য চিহ্নগুলি বর্জন করে নতুন এক ইসলামি নববর্ষ প্রচলন

ফঃ ৪

সোনার বাংলা
গড়তে
আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দুবরাজপুর (২৮৪) কেন্দ্রের
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী
অনুপ কুমার সাহা -কে
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন
নির্বাচন কেন্দ্রের উন্নয়নে পরিকল্পনা—
দুবরাজপুর শহরে একটি বাইপাস নির্মাণ।
দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে একটা আধুনিক
হাসপাতাল নির্মাণ।
এখানকার প্রতিটি গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা
বেহাল রাস্তাঘাটের উন্নতিসাধন।
ADVT.

করার তাগিদেই ওই মঙ্গল শোভাযাত্রা চালু করেছে। নববর্ষের চিরন্তন চিহ্নগুলি বর্জন করেছে বাংলাদেশ। ফলে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত নববর্ষকে আদৌ বাংলা ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে একথা বলা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে বাংলা অব্দ বা বঙ্গাব্দ কীভাবে চালু হলো তার ঐতিহাসিকতা নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। বাংলাদেশে, এমনকী আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও সাধারণভাবে মনে করা হয় বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন চালু করেছিলেন মোগল বাদশাহ আকবর। সারা বাঙ্গলায় মোগল অধিকার আকবরের সময় যেভাবে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। মোগলরা ইসলামিক হিজরি পঞ্জিকা অনুযায়ী জমির খাজনা আদায় করত বাঙ্গলায় তথা সারা ভারতবর্ষে। হিজরি পঞ্জিকা চান্দ্র পঞ্জিকা। বাঙ্গলার চাষবাস হতো সৌর চক্র অনুযায়ী। ফলে চান্দ্র পঞ্জিকার হিসেবে নতুন বছরের চক্র ফসল ওঠার সময়ের সঙ্গে মিলত না। এই অসুবিধের কথা ভেবেই নাকি আকবর বঙ্গাব্দ নামের নতুন সনের প্রবর্তন করেন। প্রশ্ন হলো, ভারতের অন্য কোথাও যেখানে মোগল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে কিন্তু আকবর এই ধরনের সনের প্রচলন করেননি। শুধু বাঙ্গলায়ই আকবর নতুন এক সন প্রবর্তন করলেন এটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য? কতটা প্রামাণ্য? তখনও বাঙ্গলায় মোগল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। মনে রাখতে হবে, মোগল অধিকারভুক্ত সমস্ত প্রদেশেই তাঁদের শাসন চলত হিজরি সন অনুসারে। বাংলাদেশের লোকশিল্প গবেষক ও শিক্ষাবিদ শামসুজ্জামান খানের মতে, আরব্য ও পারসিক শব্দের মিশ্রণেই এসেছে বাংলা সন কথাটি। তিনি আরও বলেছেন, মোগল সুবেদার নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়েই 'পুণ্যাহ' যেটি পয়লা বৈশাখে অনুষ্ঠিত হতো সেটি চালু হয়। পুণ্যাহ কথাটি সংস্কৃত, অর্থ হলো, পুণ্য + অহ অর্থাৎ পুণ্য বা পবিত্র, ধর্মীয় কাজ করার অহ বা দিন। এই প্রথা মুর্শিদকুলি খান প্রবর্তন করেননি, বাঙ্গলার জমিদারগণ অনেক আগে থেকেই রায়ত বা প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা এবং প্রজাপুঞ্জের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের দিন হিসেবে এই পুণ্যাহ উৎসব পালন করতেন। পশ্চিমবঙ্গের জমিদাররা এবং প্রজারা মোগলদের চালু করা 'হিজরি' সন মেনে নেয়নি; ফলে বাঙ্গলার নবাবেরা জমিদারদের দ্বারা চালু করা 'পুণ্যাহ'কেই রাজস্ব আদায়ের দিন হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হন। এমনকী নবাবি শাসনের পতনের পরে ইংরেজরা পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তা হলে তাঁরাও রাজস্ব আদায়ের দিন হিসেবে 'পুণ্যাহ'কে গ্রহণ করে। তাঁদের রাজত্বে প্রথম 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের মতিঝিলে। সুতরাং আকবর বা বাঙ্গলার কোনো নবাব বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ চালু করেছিলেন এটা নিশ্চিতরূপেই ভুল। অনেকে বঙ্গাব্দ চালুর কৃতিত্ব হোসেন শাহকে দিতে চান। মুশকিল হলো, কিছু ঐতিহাসিক সবকিছু শুরু করার কৃতিত্বের পেছনে সুলতানি বা মোগল হাত খুঁজে বেড়ান কোনো যুক্তি না দিয়েই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বঙ্গাব্দের সঙ্গে জড়িত মাসগুলির নাম, এর সঙ্গে জড়িত চিহ্নগুলি সবই বাঙ্গলা তথা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রখ্যাত সরকারি প্রশাসক ও ঐতিহাসিক নীতীশ সেনগুপ্তর মতে, বাংলা সনের ঐতিহ্যগত নাম হলো 'বঙ্গাব্দ'। তাঁর এবং আরও অনেক ঐতিহাসিকের মতে, বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন শুরু করেছিলেন গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক, ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর বা হোসেন শাহের অনেক আগে। বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু ব্যক্তি বলে থাকেন, ১৫৫৬ খিস্টাব্দে মোগল বাদশাহ আকবর বাঙ্গলায় 'তারিখ-ই-ইলাহি' নামে এক সন চালু করেন। ওই অব্দের বা সনের মাসগুলি ছিল, কারওয়াদিন, আরদি, বিহিসু, খোরদাদ, তীর, আমরদাদ, শাহরিয়ার, অবন, আজুর, দাই, বাহাম এবং ইস্কানদার মিজ ইত্যাদি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাঙ্গলায় ওই ধরনের কোনো অব্দ বা সাল চালু হতে পারেনি আর কোনো বাঙ্গালিও এই নামের মাসগুলির নাম শোনেনি। বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের মাসগুলির নাম বিভিন্ন নক্ষত্রের নামে দেওয়া হয়েছিল সংস্কৃত গ্রন্থ, 'সূর্য সিদ্ধান্ত' অনুযায়ী। বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রথম মাস হলো— বৈশাখ— বিশাখা নক্ষত্রের নামে; জ্যৈষ্ঠ— জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রের নামে, আষাঢ়— যাঢ়া, শ্রাবণ— শ্রবণা, ভাদ্র— ভাদ্রপদ, আশ্বিন— অশ্বিনী, কার্তিক— কৃত্তিকা, অগ্রহায়ণ— অগ্রহায়ণী বা মৃগশিরা, পৌষ— পুষ্যা, মাঘ— মঘা, ফাল্গুন— ফাল্গুনী এবং চৈত্র— চিত্রা নক্ষত্রের নামে দেওয়া হয়েছে। আর বঙ্গাব্দের সঙ্গে এই মাসগুলির নামই প্রচলিত আছে। উল্লেখ্য যে, আকবর যা কিছু চালু করেছিলেন কোথাও কোনো সংস্কৃত নাম বা শব্দ ব্যবহার করেননি। মোগল নামকরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খায় না।

বঙ্গাব্দ বা বাংলা অব্দ চালু করেছিলেন গৌড়াধিপতি রাজা শশাঙ্ক, ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে। বাঙ্গালিরা, এমনকী মুসলমান বাঙ্গালিরাও সেটাই মেনে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাস গবেষক রুমানা হাশেম বলেছেন, 'They (the Muslims) were not a religious collectivity, they retained Hindu culture for social identity, instead.' একটা বিষয় পরিষ্কার, ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গাব্দ শুরু হয়েছিল এটা নিশ্চিত, এখন যে ১৪২৬ বঙ্গাব্দ চলছে সেটা মিলে যায় অঙ্কের হিসেবেও। কালপঞ্জি অনুসরণ করলে এটাই সঠিক বলে প্রতীত হয়। বঙ্গাব্দ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বাঁকুড়া জেলার দুটি শিব মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে। একটি ওই জেলার দিহরগ্রামের শিবমন্দির, অন্যটি ওই জেলারই সোনাতপন গ্রামের শিবমন্দিরে। দুটি মন্দিরই প্রায় এক হাজার বছরের পুরানো। এ থেকে পরিষ্কার, বঙ্গাব্দ এক হাজার বছরের আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। হোসেন শাহ্ বা আকবর ষোড়শ শতকে এই অব্দের প্রচলন করেননি এটা নিশ্চিত। তাঁদের সময়ে 'বঙ্গাব্দ' প্রচলিতই ছিল। প্রচলনের বিভ্রান্তি কাটিয়ে, প্রক্ষিপ্তির ধোঁয়াশা দূর করে আসুন সবাই সমবেত হই বাংলা নববর্ষের শুভ শঙ্খধ্বনির আহ্বানে, বাঙ্গালির অন্তরে জাগ্রত হোক নববর্ষের শুভ মঙ্গলধ্বনি।

বর্ধমানের উন্নয়নের স্বার্থে
সোনার বাংলা গড়তে
বর্ধমান দক্ষিণ (২৬০) বিধানসভা কেন্দ্রে
বি.জে.পি প্রার্থী
সন্দীপ নন্দী
কে
পদ্মফুল চিহ্নে
বোতাম টিপে ভোট দিয়ে
বিপুল ভোটে জয়ী করুন।
ADVT

১লা বৈশাখ

বছর শুরুর বইপাড়া

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

সেকালে পয়লা বৈশাখে রাশি রাশি ডাব বিক্রি হতো কলেজস্ট্রিট বইপাড়ায়। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ গ্রীষ্ম, তাই প্রকাশকদের ঘর থেকে বায়নাও আসছে প্রচুর। পয়লা বৈশাখ মানে ১৫ এপ্রিল। শহরে চিরকালই বেশ গরম পড়ে যায় ওই সময়ে। এখনও যা, তখনও তাই। সেকালের শহর অবিশ্যি আজকের চেয়ে অনেক ফাঁকা-ফাঁকা ছিল। ট্রাম-বাস- ট্যাক্সি-টানা রিকশা সবই কম কম। পয়লা বৈশাখের আগের রাতে আসবাবগুলো টেনেটুনে খানিকটা জায়গা বার করা হয়েছে। সেখানে ডেকোরেটরের গুদাম থেকে আনিয়ে পেতে দেওয়া হয়েছে সারি সারি চেয়ার। লেখকরা গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে, ধুতি সামলে একসময়ে ঠিক এসে পড়তেন প্রকাশকের ঘরে। আসা মাত্র প্রকাশকমশাই হাঁক পাড়তেন— দিনু, অ-দিনু, আরও দুটো ডাব নিয়ে আয় দিকি, সঙ্গে সন্দেশ ও জলের গেলাস। তাড়াতাড়ি—। সারি সারি চেয়ার পাতা প্রকাশকমশাইয়ের ঘরে। একজন একজন করে লেখক এসে ঢুকছেন ও কুশল বিনিময় চলছে। হাত বাড়িয়ে ডাবটা নিয়ে ঘাড় তুলে একটু চুমুক। তারপর জমিয়ে আড্ডা, হো-হো-হাসি, নীচুগলায় পরচর্চা। এমনি করে কেটে যেত কয়েক ঘণ্টা। বিকেল-বিকেল রোদ একটু কমে এলে আড়মোড়া ভেঙে ধীরেসুস্থে আরেক প্রকাশকের ডেরায় রওনা হওয়া। যেন কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পুরুতঠাকুর। সেই সাতসকালে শুরু। রাত ন'টায় শেষ পুজোটা সেরে ক্লান্ত শরীরে বাড়ি ফেরা। কী করা যাবে, আজ যে লেখকদেরই দিন।

আমি, মানে এই অধমও দু'চারটে লাইন লিখে থাকি। এদিক-ওদিক কিছু কিছু বেরোয়। দু'চারটে বই দয়া করে ছেপেছেন সহৃদয় প্রকাশক। কিন্তু সে সব বই কাটতিতে বা গুনতিতে এমন কিছু নয় যে, ফি বছর ঘটা করে নেমন্তন্ন করবেন প্রকাশকমশাই। এক-আধবার যাইনি যে তা নয়, কিন্তু আমার মনে হলো প্রকাশক আর লেখককুলের আবহমানকালের রসায়ন বোঝাতে ওই অভিজ্ঞতাটুকু মোটেও কাজের হবে না। তাহলে কী করি? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। আরে আমার তো গণ্ডাকয়েক লেখক বন্ধু আছে। কেন জানি না, তাদের কেউ কেউ আমায় বেশ পাত্তাও দেয়। লেখক যখন, নিশ্চয়ই নববর্ষের দিন বইপাড়ায় যায়। প্রকাশক-প্রকাশিকাদের সঙ্গেও খাতির আছে। এক কাজ করি না কেন। পত্রিকার জন্য এই লেখাটা যখন লিখতেই হবে, তখন ওদের সাহায্য নেওয়া যাক। এখনকার সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় যাকে বলে, অভিজ্ঞতা শেয়ার করা। কয়েকজন স্বনামধন্য বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বললুম। ওঁরা দেখলুম বেশ সহৃদয়। বলল ঠিক আছে, লিখতে শুরু করো। তারপর দেখছি। এই সেরেছে, লেখা শুরু করব, তারপর ওরা ইনপুট দেবে। সে সব পেতে পেতেই তো লেখা শেষ। একজনকে ভয়ে ভয়ে কথাটা বলতেই সে বলল, কালকের মধ্যেই বলে দেব। চিন্তা নেই। পরদিন বন্ধুটি বলল তার অভিজ্ঞতা। আরও কয়েকজন বলল। শুনতে শুনতে বুঝলুম, পুরনো দিনের থেকে আড়ে-বহরে-চরিত্রে খুব একটা বদলায়নি আজকের বইপাড়ায় নববর্ষের মেজাজ।

কলেজস্ট্রিটে দিলখুশা কেবিনের উলটোদিকে টেমার লেনে নামজাদা এক প্রকাশকের দোকান। ভদ্রলোকের বয়স আশি পেরিয়েছে। কাজেকর্মে

আসন্ন বিধান সভা নির্বাচনে
রায়না বিধানসভা
মনোনীত প্রার্থী
শিক্ষক মানিক রায় কে
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন।
ADVT

টেমার লেন দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে আমারও চোখে পড়ত, একটা টুলে চুপ করে বসে আছেন প্রকাশকমশাই। খুব একটা নড়াচড়া করেন না, একঘেয়ে লাগলে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। উনি যে টুলে বসেন, তার সামনে একটা উঁচু টেবিল। সাবেককালের বাড়ি, নোনা ধরা দেওয়াল। বাইরে থেকেই দেখা যায় ভিতরের ঘরে সাজানো রয়েছে সারি সারি বই। কেমন করে উই সামাল দেন, ভগবান জানে!

সে যাই হোক, ফি বছর পয়লা বৈশাকের দিন প্রকাশকমশাইয়ের এই ঘরটা কিন্তু তালাবন্ধ থাকে। ওই বাড়িরই পিছন দিকে একটা ঘর, সম্ভবত কোনও উকিলবাবুর হবে, সেখানে সকাল থেকে চেয়ার-টেয়ার পেতে বসে থাকেন প্রকাশকমশাই। যাঁরা এই ঘরের পুরনো সাহিত্যিক, সকলের জানা আছে যে দাদা নববর্ষের দিন দোকানে বসেন না, বসেন ভিতরের একটা ঘরে। নতুন বছরে যত বই বেরল, প্রত্যেকটার একটা করে কপি সাজানো থাকে সামনে। লেখকরা একে একে আসেন, বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখেন। কোনও বইয়ের লেখক যদি সামনে থাকেন, তাঁর সঙ্গে শুরু হয়ে যায় গল্প, হাসিঠাট্টা, পিঠ চাপড়ানো। তারপর সবাই মিলে জমাটি আড্ডা। এর মধ্যে কাগজের থালায় করে চলে এল বোঁদে, মিষ্টি, চানাচুর। সঙ্গে খুরিতে করে চা। প্রকাশকমশাই অবশ্য আড্ডায় ভেসে যাওয়ার পাত্র নন। যত লেখক সেদিন এ ঘরে এসে ঢোকেন, সবার দিকেই এক এক করে তিনি এগিয়ে দেন বিশাল মোটা মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো এক খাতা। তারপর বলেন, আপনারা সবাই এই খাতাটায় কিছু কিছু করে লিখে দিন তো। যা মাথায় আসছে তাই লিখুন না, ক্ষতি কী! লেখকরা সবাই হাসিমুখে খাতা টেনে নিয়ে সেখানে লেখেন। নতুন বছরের শুভেচ্ছা? হতে পারে। শুভেচ্ছা না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে। যে যাই লিখুক, প্রকাশকমশাই তাতেই খুশি। বছরের পর বছর ধরে এইসব লেখা তিনি যত্ন করে জমিয়ে রাখেন যে!

এবার আরেক প্রকাশকের কাহিনি। এঁর ঘরে আমি নিজেও গেছি বার দুয়েক। আগের প্রকাশকের ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর ডেরায় ঢুকতে আরও একবার পেরোতে হবে হ্যারিসন রোড। টেমার লেনের দিক থেকে ফের দিলখুশার পাশের গলিতে। কফিহাউস যেতে মাঝে যে সরু রাস্তাটা পড়ে, তার ওপরেই এই বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থার বহু পুরনো দোকান। শোনা যায় সেকালের বাঘা বাঘা সব লেখক— বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, প্রবোধ সান্যাল, কালিদাস রায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়রা যখন-তখন সেই আড্ডাখানায় ঢুকে পড়তেন। শুরু হয়ে যেত গল্পের স্রোত— কতরকম যে তার মোচড় আর ভ্যারাইটি! তবে দোকান গলিতে হলেও বইপাড়ার সবচেয়ে পুরনো প্রকাশকের অফিসটি কিন্তু বাস রাস্তার ওপরেই। সাবেককালের বাড়ি, স্বাধীনতার অনেক আগে তৈরি। শোনা যায়, এককালে ডাক্তার বিধান রায় নাকি এ বাড়ির একতলায় রোগী দেখতেন। খোদ বিধান রায়ের ডিসপেনসারিতে পরবর্তীকালে যদি কারও অফিস হয়, সে কোম্পানি সফল না হয়ে যায়? সামনে একটা ঘর, ভিতরে আরও দুটো ঘর। ব্রিটিশ আমলে বানানো জলছাদ, গরমের দিনেও বেশ ঠাণ্ডা। এই প্রকাশনা সংস্থার আরও দু-তিনটে ঘর আছে পাশের গলিতে একতলা আর দোতলায়। সেখানে বসেন ওঁদের সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক এবং আরও দু' একজন কর্মকর্তা। নীচের তলায় শ'য়ে শ'য়ে বইয়ের গুদাম। অনেক বই প্যাক হয়ে চলে যাচ্ছে দপ্তরিখানায় বা দোকানে। আবার ঢুকছে নতুন বই। সারাক্ষণ ব্যস্ততা, সকাল থেকে বিকেল।

গত বছর পয়লা বৈশাখে নেমন্তন্ন পেয়ে আমিও গুটিগুটি পায়ে সেখানে গিয়েছিলাম। ঢুকে দেখি, নীচের অফিসঘর যেটা নাকি এককালে বিধান রায়ের ডিসপেনসারি ছিল, সেখানে তিলধারণের জায়গা নেই। বাঘা বাঘা সব সাহিত্যিকরা ঘেঁষাঘেষি করে বসে। যাঁদের কারোর হয়তো ছবিটুকু দেখেছি, চাক্ষুষ করার সুযোগই হয়নি এতদিন। কেউ লেখেন দেশ, আনন্দবাজারে, কেউ দু'তিনটে জাতীয় পুরস্কার পকেটে পুরে বসে আছেন। কারোর সেকুলারবাদী প্রবন্ধ আর পোস্ট এডিটে আপামর বাঙ্গালি আপ্লুত হয়ে থাকেন নিত্যদিন। কেউ আবার বনেদি প্রকাশক পরিবারের ঘরের লোক। আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল লেখক ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করলুম মহারথীদের চক্রব্যূহে! খুব চিন্তা হচ্ছিল ঢুকে তো পড়লুম, বেরোতে পারব তো? খিলানঘেঁষা এক কোনায় প্লাস্টিকের চেয়ার পাওয়া গেল। তাতেই কোনোমতে সেঁধিয়ে গেলাম। এদিকটা একটু আড়ালে, সেলিব্রিটিরা খেয়াল করছেন না, খুব শান্তির ব্যাপার। আমি একটু গুছিয়ে বসলুম, অমনি কে যেন হাতে দিয়ে গেল মুর্শিদাবাদের ছানাপোড়া, গরম ঘুগনি আর জলভরা তালশাঁসের এক ফুলকোর্স জলখাবার। এই ভালো হলো। কেউ আমাকে চেনে না, আমাকেও হাসি-হাসি চোখে কারুর দিকে তাকাতে হবে না। ওঁরা খাচ্ছেন, গল্প করছেন, তর্কও চলছে দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমার সে সব দায় নেই, কারণ আমাকে কেউ চেনে না! নিশ্চিন্তমনে ছানাপোড়া খেতে লাগলুম। ছানাপোড়ার পর ঘুগনি, তারপর জলভরা। ওঃ, লাভলি— রসনার আরামে আমার চোখ যেন বুঁজে আসছিল। প্রকাশক পরিবারের মানুষজনও ভারী সজ্জন। তাঁরা আমাকে মিষ্টি করে আপ্যায়ন করলেন, খামে ভরা চেক দিলেন, তারপর হাতজোড় করে বললেন, আপনি এসেছেন খুব খুশি হয়েছি, পরে আবার আসবেন। আনন্দে উড়তে উড়তে বাইরে এসে খামটা খুলে দেখি, ভেতর কোনও চেক-টেক নয়, রয়েছে কড়কড়ে দু'হাজার টাকা!

এবার কলেজস্ট্রিটের জাঁদরেল এক প্রকাশকের গল্প। যতদূর শুনেছি, ইনি নাকি বইপাড়া চত্বরেই থাকেন। নীচের মহল্লায় বিরাট বইয়ের দোকান, সেখানে তাঁর পাবলিকেশনের বই ছাড়া অন্যদের বইও পাওয়া যায়। ওঁর দোকানে সারা বছর এত বিক্রি যে, প্রকাশকরা যেচে এসে বই দিয়ে যান দু'কপি বাড়তি বিক্রির আশায়। আমার এক জনপ্রিয় লেখক-বন্ধু ফিডব্যাক দিয়েছেন, পয়লা বৈশাখ মানেই জাঁদরেল সেই প্রকাশকমশাইয়ের খাসতালুকে মাংসভাত। না, সক্কলের জন্য নয়। এ শুধু দোকান আর প্রকাশনা কর্মীদের স্পেশাল নেমন্তন্ন। সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁদের বাড়ির লোকেরাও থাকেন এবং ভরপেট মাংসভাত খান তাঁরাও। শেষ পাতে পায়েস আর মিষ্টি, একেবারে কম্পালসারি। নববর্ষের দিন বেলা একটু গড়ালে স্নান সেরে জমকালো পাজাবি পরে দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন কর্তামশাই। ততক্ষণে অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। ধীরে ধীরে জমে উঠছে আড্ডা, চলছে চা, চলছে সিগারেট, হাতে হাতে ঘুরছে মিষ্টির থালা। এরই মধ্যে ঘাড় নামিয়ে কোনও জনপ্রিয় লেখকের সঙ্গে টুকটাক কথা সেরে নিচ্ছেন প্রকাশকমশাই। কে জানে, হয়তো পরের বইটার জন্য বায়না করে রাখলেন। সবই তো আসলে ব্যবসার অঙ্গ, কী আর করা! তারপর উঠে যাওয়ার আগে লেখকদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন লাল টুকটুকে এক খেরোর খাতা। সে তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হোন, সমরেশ মজুমদার হোন, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অথবা কোনও তরুণ লেখক।

—কিছু লিখে দিন ভাই, যা মনে আসে আপনার। দিনটা স্মরণীয় করে রাখতে হবে তো!

—আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুলেই গেছিলাম। দিন আপনার খেরোর খাতা। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দেন লেখক। এই খাতাই লেখক-প্রকাশকের সবচেয়ে বড়ো বাঁধন। ফি নববর্ষে যার ওপর পড়ে আরেকটা করে নতুন গিট। এই প্রত্যাশায়, যেন কোনোদিনও আলগা না হয়ে যায় দু'জনের সম্পর্ক।

সম্পর্কই তো বইপাড়ার হৃদয় এবং ফুসফুস! □

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে

২৯২ হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে

ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী

নিখিল ব্যানার্জী-কে

বিজেপি

পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করুন

হাঁসন বিধানসভা ক্ষেত্রের সমস্ত নাগরিকের সুবিধার জন্য আগামীদিনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রূপায়ণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে—

১) দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাঁসনের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা।

২) হাঁসন বিধানসভার অন্তর্গত তারাপুর, বিষ্ণুপুর ও লোহাপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণ।

৩) স্থানীয় কৃষকদের কৃষিকাজের সুবিধার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও জলসেচ ব্যবস্থা।

৪) ব্রাহ্মণী নদীর উপর দেবগ্রাম-ভদ্রপুর সেতু ও দ্বারকা নদীর উপর মাড়গ্রাম-তারাপীঠ সংযোগকারী সেতু নির্মাণ।

৫) তারাপীঠ মাড়গ্রাম হাঁসন ভদ্রপুর ও লোহাপুর সংযোগকারী রাস্তার সম্পূর্ণ সংস্কার করা হবে।

৬) প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ।

৭) হাঁসনের প্রতিটি মানুষের সুবিধার্থে সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন।

৮) ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পী ও তাঁত শিল্পীদের সামগ্রিকভাবে সহায়তা প্রদান।

৯) স্কুল শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হবে।

ADVT.

১লা বৈশাখ

হিন্দুর জীবনে একটি বরণীয় দিন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

হিন্দুর প্রাণভোমরা ধর্ম। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্রিয়াকর্মেই হিন্দু স্মরণ করে তার ঈশ্বরকে। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-শোক জীবনের প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি ভাবনা-চিন্তা অথবা প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে ধর্ম। রয়েছেন ঈশ্বর। তাই প্রতিটি অনুষ্ঠানের আগেই হিন্দু মগ্ন হয় দেবতার আরাধনায়, পুজো অথবা যাগযজ্ঞে। এক অর্থে বলা যায়, পুজো-প্রার্থনা-হোমযজ্ঞ রয়েছে হিন্দুর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। আর সে কারণেই পয়লা বৈশাখ ও নববর্ষের দিনেও হিন্দুরা মেতে উঠবেন নানা পুজো বা যাগযজ্ঞে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

পয়লা বৈশাখ— বাংলা বঙ্গাব্দের প্রথম মাসের প্রথম দিন। প্রাথমিক ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা বিভিন্ন পুজোর মধ্য দিয়ে তাঁদের কারবারের নতুন করে সূচনা করেন। তাছাড়া সাধারণ গৃহস্থও এদিন তাঁদের আরাধ্য দেব-দেবীর বিশেষ পুজো করেন। হিন্দুর যে কোনো অনুষ্ঠানের মতোই দিনটির সূচনা হয় গঙ্গায় অবগাহনের মধ্য দিয়ে। অবশ্য যেখানে গঙ্গা নেই সেখানে নদী বা সরোবরে স্নান করারও বিধি রয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এখন অবশ্য বেশিরভাগ মানুষ বাড়িতেই সাঙ্গ করেন স্নানপর্ব।

স্নানের পর সূর্য প্রণাম। সূর্যই জগতে সব শক্তির উৎস। তাই সেই শক্তিকে সবসময়ই শ্রদ্ধা জানায় হিন্দু। শুধু সূর্যপ্রণাম নয়, সূর্যপুজোরও আয়োজন করা হয় কোথাও কোথাও। সংকল্পের সময় তো সূর্য বা ভাস্কর কোন রাশিতে রয়েছে তার উল্লেখ করা হয় সর্বত্রই।

প্রাচীনকালে নববর্ষবরণের অন্যতম অঙ্গ ছিল ধ্বজারোপণ। ওইদিন সকালেই নিয়ম মেনে মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে গৃহে ধ্বজা বা পতাকা উত্তোলন করেন। অন্য কোনো বিশেষ পুজো অর্চনা করা না হলেও নববর্ষের দিন প্রতিটি গৃহে ধ্বজারোপণ বা উত্তোলন একটি আবশ্যিক কর্ম। বঙ্গদেশে কোনোদিনই এই ধ্বজারোপণের তেমন প্রচলন ছিল না। এখন তো প্রায় নেই-ই। ক্বচিৎ কখনো কোনো কোনো গৃহে এই অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়।

নববর্ষে বঙ্গদেশে সামগ্রিকভাবে যেসব

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

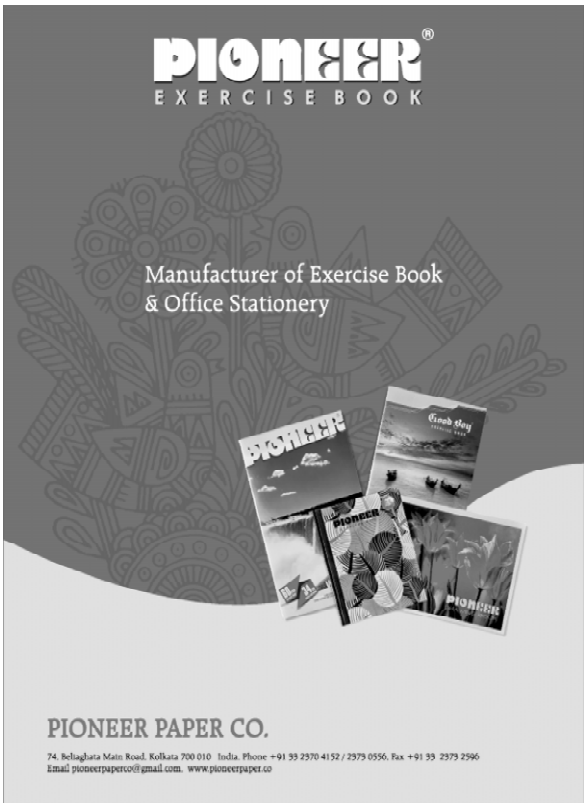

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

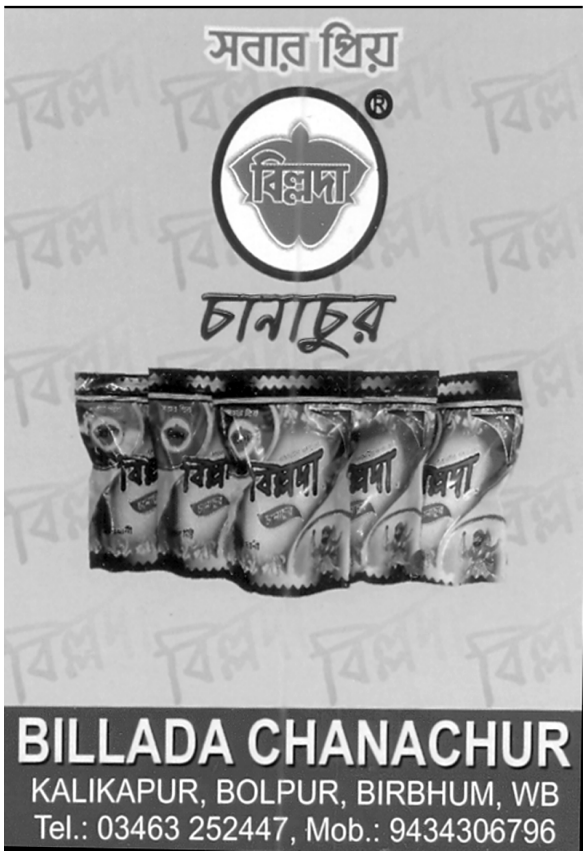

দেব-দেবীর পুজো হয় তার মধ্যে রয়েছে গণেশ পুজো, লক্ষ্মী বা ভগবতীর আরাধনা। তাছাড়া গৃহদেবতার বিশেষ পুজোও এই দিনের একটি কৃত্যক। বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দিরে অথবা যেসব ধনী ব্যক্তির গৃহদেবতার জন্য পৃথক মন্দির রয়েছে সেখানেও দেবতার অভিষেক, নতুন শস্য দিয়ে তৈরি বিভিন্ন উপাচার নিবেদন করা হয় দেবতার ভোগ হিসেবে। কিন্তু অন্যত্র বেশি গুরুত্ব পায় গণেশ বা লক্ষ্মী পুজো। কোথাও কোথাও করা হয় ভগবতীরও আরাধনা।

হিন্দুর উপাস্য দেব-দেবীর সংখ্যা বড়ো কম নয়। তা সত্ত্বেও গণেশ-লক্ষ্মী বা ভগবতীর অর্চনা কেন এই দিনটিতে বিশেষ গুরুত্ব পায় সেই প্রসঙ্গেই এবার আসা যাক।

গণেশ হলেন সিদ্ধিদাতা। যে কোনো দেবতারই পুজোয় প্রথমে গণেশের অর্চনা করা হয়। সে শাক্ত, বৈষ্ণব অথবা শৈব কিংবা গৌড় যে সম্প্রদায়ের যে পুজোয়ই আয়োজন করা হোক না কেন, সকলের শুরুতে গণেশের আরাধনা করতে হয়। এ সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে।

একসময় দেবী পার্বতী নিজের দেহমল দিয়ে খেলার ছলেই একটি পুতুল তৈরি করে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন। এই পুতুল হয় তাঁর সন্তান গণেশ। গণেশকে পাহারায় রেখে পার্বতী যান স্নানঘরে। যাওয়ার আগে বলেন, কাউকেই যেন ভেতরে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

গণেশ যখন দৌবারিক, সেই সময়ই মহাদেব আসেন। গণেশ বাধা দেন। শিব নিজের পরিচয় দেন। তবুও গণেশ নিজের কর্তব্যে অবিচল থাকেন। কথায় কথায় শুরু হয়ে যায় দুজনের মধ্যে যুদ্ধ। আর সেই সময় শিবের পাশুপাত অস্ত্রে কাটা যায় গণেশের মাথা। নিষ্প্রাণ মস্তকহীন গণেশের দেহ পড়ে থাকে সেখানে।

ততক্ষণে পার্বতী চলে আসেন। সেখানে শিব আর প্রাণহীন গণেশকে দেখেই পার্বতী বুঝতে পারেন সর্বনাশ যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আর সেই বুঝেই কান্নায় পার্বতী তখন যেন ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষ। তাঁর কান্নায় কাতর হন শিবও। পার্বতীকে শান্ত করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু পার্বতীর এককথা, আগে বাঁচিয়ে দাও আমার গণেশকে।

শিব তখন গণেশের ছিন্নমুণ্ডটি আনতে বলেন। কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না তা। তখন শিবই উত্তরশিয়রে প্রথম প্রাণীটিকে দেখামাত্র তার মাথাটি কেটে আনতে বলেন। আর তাতেই একটি হাতির মাথা কেটে নিয়ে আসে তাঁর অনুচররা। শিব সেটিই বসিয়ে দেন

গণেশের দেহে। জেগে ওঠেন হস্তিমুণ্ড গণেশ। কিন্তু পার্বতী মেনে নিতে পারেন না এটি। তাই থামে না তাঁর কান্না। শিব তখন বলেন, তোমার ছেলে হস্তিমুণ্ড হলেও সব দেবতার আগে হবে তার পুজো। আর গণেশ হবে সিদ্ধিদাতা।

শিবের সেই বয়ের কারণেই সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো হয় সকলের আগে। ব্যবসায়ীরাও তাঁদের ব্যবসার সর্বসিদ্ধি এবং লাভের আশায় নববর্ষের এই শুভদিনে গণেশ পুজো করে হালখাতা বা ব্যবসায় নতুন হিসেব-খাতার সূচনা করেন। খাতায় সিঁদুর দিয়ে 'গণেশায় নমঃ' লিখে এবং টাকার ছাপ ও স্বস্তিক চিহ্ন আঁকা হয় নতুন খাতায়।

গণেশের মতোই নববর্ষের প্রথম দিনে লক্ষ্মীরও বিশেষ পুজো করা হয়ে থাকে। লক্ষ্মীর অপর নাম শ্রী। লক্ষ্মী বা শ্রী হলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং সমৃদ্ধি বা সম্পদের দেবী। তিনি পদ্মাসনা বা পদ্মহস্তা। সাধারণত দুটি বা চারটি হাত। কখনও কখনও বহুবাহু লক্ষ্মীরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত লক্ষ্মী হলেন তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তবে চন্দ্রপ্রভার মতো শ্বেতবর্ণা লক্ষ্মীরও ধ্যান মন্ত্র রয়েছে।

লক্ষ্মী সৌন্দর্যের প্রতীক। তাঁর জন্য দেবতারা একবার শ্রীভ্রষ্ট হন। শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনি, প্রজাপতি সৃষ্টি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাঁর দেহ থেকে শ্রী বের হয়ে আসেন। তিনি এতই সুন্দরী যে তাঁকে দেখে দেবতারা তাঁকে হত্যা করতে যান। স্ত্রী হত্যা থেকে সকলকে নিরস্ত করেন প্রজাপতি। কিন্তু দেবতারা তাঁর সব বিভূতি আত্মসাৎ করে। পরে লক্ষ্মী তাঁদের নৈবেদ্য দিয়ে সন্তুষ্ট করে বিভূতি ফিরে পান।

মহাভারতে লক্ষ্মী যুক্ত হয়েছেন কুবেরের সঙ্গে। সেখানে পরে তাঁকে কুবেরের স্ত্রী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুবেরও সম্পদের অধিষ্ঠাতা। তাই লক্ষ্মী পুজোর সময় কুবেরেরও পুজো হয়। স্বভাবতই এহেন লক্ষ্মীর কৃপা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকেন সকলে। সেই কারণেই ব্যবসায়ী ও কারবারিরা তাঁর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য পয়লা বৈশাখ তাঁর আরাধনা করে থাকেন। সাধারণত গৃহস্থরা অনেকেই পয়লা বৈশাখ ভগবতীর অর্চনা করে থাকেন। গোরুকে কল্পনা করা হয় ভগবতী হিসেবে। এ কারণেই এদিন গোয়াল পরিষ্কার করে, গোরুকে ভালো করে তেল হলুদ দিয়ে স্নান করিয়ে গৃহস্থ ভগবতী পুজো সাঙ্গ করেন।

এছাড়াও পয়লা বৈশাখ বিভিন্ন দেব-দেবীরই বিশেষ পুজো হতে দেখা দেখা যায়। এদিন থেকেই শুরু হয় মাসব্যাপী কেশবব্রতও। সব মিলিয়ে, পয়লা বৈশাখ হিন্দুর জীবনে শুধুই একটি দিন নয়, পয়লা বৈশাখ সকলের কাছে মঙ্গল ও শ্রী'রও প্রতীক। একই সঙ্গে ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য সকলে এদিন নানা অনুষ্ঠান এবং দেবতার আরাধনা করে থাকেন। বলা যায়, হিন্দুর জীবনে এইভাবে পয়লা বৈশাখ একটি বরণীয় পবিত্র দিনও হয়ে উঠেছে। নানা সংকটের মধ্যেও তাই নববর্ষের এই দিনটিকে ধর্মীয় ও আনন্দের আবহে উদ্‌যাপনে সচেষ্ট হন সকলে।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও গবেষক)

CAPITAL TRANSPORT CORPN. OF INDIA

H.O.

25, Gangadhar Babu Lane, Kolkata - 700 012 Phone : 2215-4312, 2236-0713

Branches:

Aligarh l Mumbai * Delhi l Durgapur * Hyderabad l Chennai * Vezianagaram

nmc JAS-ANZ

NANDA MILLAR COMPANY

Engineers s Consultants
Manufacturers s Exporters

1/2, Chanditala Branch Road,
(Near Behala Chandi Mandir)
Kolkata - 700 053, India
Phone : 24030411
Mobile : 98300 78763, Fax : 91-33-24030411
E-mail : nmc@nandagroup.com
Web Site : www.nandagroup.com

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Ph. 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

With Best Compliments From :

M/s. OUTBOX CARGO SERVICES LLP

SAGAR ESTATE BUILDING
2, N.C. DUTTA SARANI
ROOM NO. 2, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700001

KAMAL AGARWAL
Contact No.
M : 98300 23126
O : 91-33-40033326 / 40055518
Fax : 91-33-2230-6490
e-mail : info@outboxcargo.com

১লা বৈশাখে

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বারপুজো ছিল দেখার মতো

স্বপন সেনগুপ্ত

সত্তর সালের ফেব্রুয়ারিতে দলবদলে খিদিরপুরকে বিদায় জানিয়ে ইস্টবেঙ্গলে সই করলাম। ময়দানে ১ বৈশাখে ক্লাবে ক্লাবে বার পুজোর আয়োজন বহুদিন ধরে চলে আসছে। খিদিরপুরে থাকাকালীন দেখেছি পয়লা বৈশাখে মন্দিরে পুজো দিয়ে মাঠে অনুশীলনে আমাদের প্রসাদ বিতরণ করে বার পোস্টে গঙ্গাজল ছিটিয়ে কর্মকর্তারা সিঁদুরের ফোঁটা দিতেন। এটা আমাদের কাছে তখন একটা নতুন ব্যাপার ছিল।

কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে আসার পর পয়লা বৈশাখের বার পুজো দেখে মনে হয়েছে যেন একটা সার্বজনীন উৎসব। আমরা অনুশীলনের জন্য সবাই সকাল ৭টায় ক্লাবে হাজির হতাম। সেই বছর কোচ ছিলেন বোম্বে থেকে আসা মহম্মদ হোসেন। পয়লা বৈশাখের আগের দিন ক্লাব ফুটবল

বারপুজোর কার্যক্রম চলছে। (ফাইলচিত্র)

সেক্রেটারি খোকন সেন সবাইকে বারপুজো উপলক্ষ্যে সকাল ৭টায় ক্লাবের মাঠে হাজির হতে বলেছিলেন। পরের দিনে মাঠে হাজির হয়ে দেখি পরিবেশ আগের দিনের তুলনায় একেবারে আলাদা। ইস্টবেঙ্গলের গেট ফুল-মালা দিয়ে সাজানো। ত্রিপলের টেন্ট ফুল-মালা দিয়ে সাজানোতে চেনাই যাচ্ছিল না। সারা মাঠ লাল হলুদ ছোটো ছোটো পতাকায় সুসজ্জিত থাকত। মাঠের দুদিকে ঝকঝকে দুধ সাধা গোলপোস্টে পুজোটা হতো।

ফুটবল সেক্রেটারি খোকন সেন কালীঘাট মন্দির থেকে পুরোহিত এনে পুজো, যজ্ঞ করাতেন। পুজো শুরু হতো সকাল ৮টায়। আজও মনে পড়ে সেই পুজোর সকালে গ্যালারি ভরতি উৎসাহী সমর্থকদের ভিড়। ক্লাব সভাপতি-সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও ক্লাব তাঁবুতে সেদিন হাজির থাকতেন। সেদিন একটি নতুন বলকে পুজো করা হতো। বার পুজোতেও আমাদের সবাইকে থাকতে হতো। পুজোর পর সবাই মিলে অঞ্জলি দিতাম। পুজো শেষে এলাহি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। সেদিনের বারপুজো উৎসব দেখে ইস্টবেঙ্গলের প্রতি একটা আলাদা অনুভূতি মনে জাগে।

৭০ সালের আইএফএ শিল্ড ফাইনাল সম্ভবত ২৪ সেপ্টেম্বর হয়েছিল ইডেন গার্ডেনে। সেমি ফাইনালে মহামেডানকে ১-০ গোলে হারিয়ে আমরা ফাইনালে পৌঁছই। অপরদিকে ইরানের পাস ক্লাব মোহনবাগানকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। কিন্তু ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল টিমকে কোচবিহীন নামতে হয়, লিগের মাঝপথেই কোচ মহম্মদ হোসেন বোম্বে চলে যান।

৭০ সালের আইএফএ শিল্ড ফাইনাল আজও ইতিহাস হয়ে আছে, কারণ ইরানের দলটি ছিল জাতীয় খেলোয়াড়ে ভরা প্রথম সারির দল। ইডেন গার্ডেনে সেদিন এক লক্ষের ওপরে দর্শক এবং ইডেনের বাইরেও প্রায় সমসংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল টিম ক্লাব থেকে বেরোনোর পর আমরা ইডেনের দর্শকদের গর্জন শুনতে পাই। আইএফএ শিল্ডে চোটের জন্য সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ পাইনি। ফাইনাল খেলাটা দিন তিনেক পর হওয়ার জন্য আমি চোট সারিয়ে নিজেকে সুস্থ করি।

ফাইনালের দিন ক্লাবে টিম মিটিং-এ জানতে পারলাম আমাকে প্রথম একাদশে রাখা হয়েছে। সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করেছিলাম সেই ঐতিহাসিক ফাইনাল খেলা। প্রথমার্ধ ড্র থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে নতুন উদ্যমে পাস ক্লাবের উপর চাপ দিতে থাকি। খেলার শেষ লগ্নে দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় মহম্মদ হাবিব চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান। পরিবর্তে নামেন পরিমল দে। তখন খেলা শেষ হতে বাকি এক মিনিট। ইস্টবেঙ্গল সাইডের ডান দিকের সাইড ব্যাক নাইমের কাছ থেকে বল পেয়ে ইরানের দুর্ধর্ষ ব্যাক দলের অধিনায়ক হাবিবকে এবং দৈত্যসম চেহারার হালুয়াইকে কাটিয়ে তীব্র গতিতে সামনে শুধু ইরানের গোল বক্সে পৌঁছে দেখি ইরানের গোলকিপার। হঠাৎ কানে স্বপন আওয়াজ আসে। চোখ তুলে বাঁ দিকে তাকাতে দেখি পরিমলদা (জংলা) আমার পাশে। পরিমলদা তখনও একটা বলও পায়নি। খেলার শেষ মুহূর্তে আমার পায়ের বলটি পরিমলদাকে এগিয়ে দিলাম। ওর নেট জালে জড়িয়ে গেল। রেফারিও বাঁশি বাজিয়ে খেলা শেষ করে দিলেন।

সেদিন মাঠ থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পর্যন্ত দর্শকের কাঁধে চেপে ফিরতে হয়েছিল। সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের প্রতীক চিহ্ন মশাল যাত্রা। সেই মশালের আলোয় সারা স্টেডিয়াম আলোকিত হয়েছিল। তখন ছিল না দূরদর্শন, ছিল না মিডিয়ার এত রমরমা, শুধু ছিল রেডিয়ো। যারা মাঠে যাওয়ার সুযোগ পায়নি তারা রেডিয়োতে ধারাভাষ্য শুনে আজও সেই খেলার স্মৃতি বহন করে চলেছে। স্বনামধন্য দুই ভাষ্যকার অজয় বসু এবং কমল ভট্টাচার্য আজও ফুটবল প্রেমী দর্শকদের মনে গেঁথে আছেন।

১৯১১ সালে মোহনবাগান গোরা সাহেবদের হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জয় করে যে কীর্তি রচনা করেছিল ইস্টবেঙ্গলও সেরকম ১৯৭০ সালে ইরানের পাস ক্লাবকে আইএফএ শিল্ডে হারিয়ে সে ধরনের কীর্তি রচনা করে। আজও ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে এই জয় আলোচিত হয়।

(লেখক ইস্টবেঙ্গল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক)

নববর্ষে আমাদের চৈতন্যোদয়

ড. স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

চূড়ান্ত স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক এক সমাজের পথে এগিয়ে চলেছি আমরা। স্বাধীনতা উত্তরকালে, ঠাকুর যে ভাবধারায় আধ্যাত্মিক সাধনা ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে সমন্বয় চেয়েছিলেন আমরা তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছি। যে শিক্ষাব্যবস্থাকে আহ্বান করে এনেছি তার প্রাণকেন্দ্রে এসে বসেছে কেবলমাত্র অর্থচিন্তা। নীতি, নৈতিকতা সেখানে পোশাকি শব্দ। কাব্যে এর উল্লেখ রয়েছে, কার্যে নয়। বক্তৃতার মঞ্চে তার প্রবল প্রচার, গৃহের অঙ্গনে ও কর্মস্থলে তার নীরব অনুপস্থিতি। প্রলয় থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়াগে গমন করেও শান্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম, কারণ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তীর্থস্থানকেও গ্রাস করেছে।

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন এবং পারিবারিক সনাতন রীতিনীতি সম্পর্কে বিরাগ নিয়ে যে আত্মবিস্মৃত নতুন প্রজন্ম ভারতবর্ষের ঋষিকুলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সহবত শিক্ষাকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি চর্চার দ্বার খুলে দিচ্ছে তার আঘাতে আমরা নিজেরাও বিপন্ন।

প্রথম থেকেই আমরা আত্মকেন্দ্রিকতাকে এমনভাবে জাগিয়ে তুলছি যে পরিণত বয়সে আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে শুয়ে আক্ষেপ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকছে না। চেতনার জগতে ঠাকুরের প্রদর্শিত পথে এগোলে এমন পরিণতি তো হওয়ার কথা ছিল না। মনুষ্যত্ব অন্ধকারে রোদন করছে সে কি 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত' এই মন্ত্র শ্রবণ করেছে? যদি করত তাহলে আজ আমরা পরমুখাপেক্ষী ও পরপদে আত্মনিবেদিত এক জাতি হিসেবে পৃথিবীর সামনে প্রতীয়মান হতাম কি?

সমগ্র বিশ্বেই মূল্যবোধের সংকট দেখা দিচ্ছে। ধর্মকে ধর্মতন্ত্রের মোহ গ্রাস করে সমস্যা শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। শুদ্ধ ধর্মতত্ত্বকে ধর্মতন্ত্রের বেষ্টনী থেকে বের করে এনে

মুক্তভাবে সাধনার যে দিশা ঠাকুর দেখিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় সে ভাব আজ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হতে পেরেছে। সমগ্র বিশ্ববাসীকে এই ভাবের মর্মার্থ প্রচার করতে হবে তবেই বিশ্বশান্তির পরিমণ্ডল রচনা করা যাবে যেখানে আমরা পরকে আপন করে, মূল্যবোধের সংকটকে কাটিয়ে তুলে, আত্মপ্রচারের আনন্দে না ভুলে, নীতিহীন স্বার্থচিন্তাকে দূরে সরিয়ে, ভালোবাসার মন্ত্রে, ভ্রাতৃভাবে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বহুর মধ্যে সেই একের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারব— তখনই সার্থক হবে প্রাচীন ঋষিমন্ত্র।

পৃথিবীর কোনও জাতি তাঁর অতীত সম্পর্কে উদাসীন থেকে মহান হতে পারেনি। উন্নত মূল্যবোধের অধিকারী হতে গেলে তার উৎসস্থল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর ঐতিহ্য সম্পর্কিত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বেদ উপনিষদের ঐতিহ্য না থাকলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বকবি হওয়া সম্ভবপর হতো না, যোগচর্চার ঐতিহ্য না থাকলে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধ্যানৈশ্বর্য না পেলে বিবেকানন্দ বিশ্বজনকে মোহিত করতে পারতেন না। বৈষ্ণবধর্মের বিশ্বপ্রেম এ দেশে না থাকলে মহত্মাজী যুযুৎসু ইংরেজকে অহিংস পদ্ধতিতে পরাজিত করতে পারতেন না।' স্বাধীনতার পর পাশ্চাত্যের চোখে প্রাচ্যের বিচার করতে গিয়ে আমরা গোড়াতে গোল বাধিয়ে রেখেছি। এখন মূল্যবোধের সংকটকালে নীতিশিক্ষাকে প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথা জোরের সঙ্গে প্রচার হওয়া প্রয়োজন। চিন্তা করার সময় এসেছে ধর্ম থেকে তাঁরা কীভাবে আদর্শকে খুঁজে নিয়েছিলেন। এছাড়া মুক্তির পথ নেই। পুনরায় মর্মে মর্মে তাদের বাণী শুনতে হবে। বিশ্বব্যাপী স্বার্থপরতার মহাকর্মশালায় অহরহ ভোগবাদের যে প্রবল প্রচার চলছে কর্মজালবেষ্টিত চেতনাবোধ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত চৈতন্য হতে বহু দূরে।

পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত পেরিয়ে নতুন কালের সুচনালগ্নে ধর্মবোধ আমাদের কেন্দ্রে থাকুক। ধর্মবোধের আকর্ষণে আমরা আবদ্ধ হই। আমাদের সংসার ব্রহ্মের দ্বারা পরিচালিত এই ভাব নিয়ে যদি চলি তাহলে সংকীর্ণতা কেটে যাবে। আমাদের ধর্ম অন্তরের মধ্যে অন্তরতরকে সন্ধান করেছে। চৈতন্যের রথে সারথি হওয়ার জন্যে সেখানে বাইরের স্বার্থদ্বন্দ্ব কোলাহলে অন্তর কলুষিত হয়নি বহির্জগতের বৈরিতা হৃদিমন্দিরকে প্রভাবিত করেনি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের আনুষ্ঠানিক ভিন্নতা মানুষের মূল্যবোধের ভিত্তি যে অনন্ত প্রেমপূর্ণ একাত্মতা সেই ভাবকে গ্রাস করেনি, বাইরের গতি অন্তরের স্থিতিকে অখণ্ড ব্রহ্মের সন্ধানে যাত্রায় বাধা সৃষ্টি করেনি। সেজন্য সংসারকে সুন্দর করতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত 'তোমাদের চৈতন্য হোক' এই আশীর্বচনের অন্তর্নিহিত অর্থকে অনুকরণ করে চলার চেষ্টা করলে ও পাথেয় হিসেবে নিতে পারলে আমরাই লাভবান হব।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক)

বিদেশি দর্শনের আফিম ছাড়ার সময় এসেছে

পার্থসারথি গুহ

তুমি বিজেপি করো? প্রতিবেশী কাকুটি যখন একথা জিজ্ঞেস করলেন তখন কেমন অবাক চোখে দীর্ঘদিনের চেনা মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিল প্রতীক। এতদিন এই তল্লাটে থাকে। সুবলকাকুর সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ওদের। কোনওদিন মনে হয়নি মানুষটি তার রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। অথচ আজ সেই সুবলকাকুই কিনা প্রতীকের বিজেপি করা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন!

কই সুবলকাকুও তো একসময় কংগ্রেস করতেন। তার দুই ছেলে আবার সিপিএমের ঝান্ডা ধরেছিল। আড়ালে সবাই অবশ্য বলত সুবলকাকুই সন্তর্পণে ছেলেদের সিপিএমে ভিড়িয়ে দিয়েছেন। যখন বুঝতে পেরেছেন কংগ্রেস জমানা শেষ তখন ক্ষমতার মৌরসিপাট্টা হাতে রাখতে সিপিএমের সঙ্গে এভাবে আপোশ করেছিলেন। যদিও নিজে সেই আদ্যিকালের মতো ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে কংগ্রেসের সভাসমিতিতে যেতেন। সেই মানুষটা কিনা প্রতীকের বিজেপি করা নিয়ে অবাক হচ্ছেন এমন একটা ভাব যেন বিজেপি এই ধরাধামের দলই নয়। মঙ্গলগ্রহ বা অন্য কোথাও থেকে আমদানি হয়েছে।

সুবলকাকুর ঘটনা এক-আধটা ব্যতিক্রমী বলে মোটেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরং জাতীয়তাবাদী বিজেপির প্রতি এই বিতৃষ্ণাই যেন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে কয়েক যুগ ধরে। এবার সেই অপসংস্কৃতির গোড়া যদি খুঁজতে যাই তবে অবশ্যই সেই গান্ধী-নেহরু পরিবারের বশংবদ কংগ্রেসের কথা আসবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী, পটেল, সাভারকারদের অবদানের কথা যারা হেলায় উড়িয়ে দিতে পারে তাদের কাছে কতটাই-বা সম্মান প্রাপ্য?

পশ্চিমবঙ্গে সত্তরের দশক থেকে যে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয় নকশালদের হাত ধরে তা ছিল উগ্র বাম রাজনীতির ধারা। রাজ্যের প্রচুর উচ্চশিক্ষিত ছেলে-মেয়ে এই 'আত্মাহুতি'র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর সেইসময় থেকেই মার্কস,অ্যাঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, মাও-সে-তুংদের চর্চা শুরু হয় গণহারে। এমন একটা ভাব যেন ভারতবর্ষের মতো সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী দেশের ঋষি, মুনি বা মহাপুরুষদের সমাজ গঠনে কোনও ভূমিকাই নেই। যা কিছু ভালো সব ওই রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবার। স্তালিনের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ নিধন, কম্বোডিয়ার পল পটের অত্যাচার সবই যেন খুব স্বাভাবিক ঘটনা। দিগ্‌গজ কমরেডরা সাফাই দিতে শুরু করেন সমাজের বা রাষ্ট্রের সার্বিক মঙ্গলসাধনায় এই ধরনের পদক্ষেপ জরুরি ছিল। বস্তুত গণহত্যা তাদের ভাষায় গণকল্যাণে পরিণত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে 'গাছের খাওয়া ও তলার কুড়নোর' ভঙ্গিমায় এই রাজ্যে ৩৪ বছরও বামফ্রন্ট সরকার পরিচালিত হয় তারা উন্নয়নের ছিঁটেফোঁটা উপহার দিতে না পারলেও, মানুষের প্রকৃত চাহিদা পূরণ না করলেও সুকৌশলে মার্কস-মাও কালচারটাকে বাঙ্গালির রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ড্রাগসের নেশার মতো সেই ভয়ংকর রাজনীতির বীজ ছড়িয়ে পড়েছে শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে।

কমিউনিজমের আঁতুড়ঘর সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গে কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে বসা আঁতেল গোছের কিছু 'মহাপণ্ডিত' বামপন্থী সাহিত্যসাধনা চালিয়ে গিয়েছেন। যদিও তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপামর বঙ্গবাসীর সায় না থাকলেও তৎকালীন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার এই 'চাপিয়ে দেওয়া চৌদ্দআনা' পরিচালিত হয়েছে।

গর্বাচেভের 'পেরেস্ত্রোইকা, গ্লাসনস্ত'-এর জাদুকাঠিতে রাশিয়ার ভণ্ড কমিউনিস্টরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হয়েছে। মার্কস-লেনিনের মূর্তি ভাঙা, কবর খোড়া, রোমানিয়ার অত্যাচারী শাসক চেসেস্কুকে ক্ষিপ্ত জনতার মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার পরেও হেলদোল হয়নি এখানে। মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গীর মতো গণহত্যার মাধ্যমে স্তালিন, পল পটের প্র্যাক্টিস এখানে সুকৌশলে ঝালিয়ে নিয়েছে বামপন্থীরা। একদিকে প্রলেতারিয়েতের কথা বলে বিরোধীশূন্য শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, অন্যদিকে রাশিয়ান সাহিত্য পাঠের চর্চা অদ্ভুত এক মেলবন্ধন ঘটিয়ে গিয়েছে পূর্বতন কমিউনিস্ট শাসকরা।

বিগত দশ বছরের তৃণমূল শাসনে এটা আরও লালিত হয়েছে। মুখে সিপিএম তথা বাম বিরোধিতার কথা বলে ক্ষমতায় আসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এক্সটেন্ডেড বাম সরকার বলেই পদে পদে নিজেদের চিনিয়েছে। আর এই বাম ফসলি জমিতে বেড়ে ওঠা পরিযায়ীরা শুধু একটু রং বদলেছেন।

এই অপসংস্কৃতি বদলের সন্ধিক্ষণে এখন আমাদের রাজ্য। সামনে হয়তো সেই দুদিন আসতে চলেছে যখন বিজেপি করার জন্য কেউ ভ্রূ কুঁচকাবে না কিংবা একঘরে করে রাখবে না। বরং একজন বিজেপি কর্মীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি দেবেন। কারণ তাঁরা অচিরেই বুঝতে পারবেন বাঙ্গলার দীর্ঘদিনের অবক্ষয় মুক্ত করে আজ সত্যি সোনার বাঙ্গলা গড়ার কাজে লিপ্ত রয়েছেন এই বাঙ্গলারই দামাল ছেলেরা। আপদেবিপদেও যেমন তারা পাশে থাকবে তেমনি নবপ্রজন্মের কাছেও প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলবেন। রাষ্ট্রীয়তার অনুশাসনে বলীয়ান হয়ে যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝা, তুফানে এই দেশপ্রেমিকদের পাশে পাওয়া যাবে।

না, সেখানে কোনো রাশিয়া বা চীনের নেতার মডেল করতে হবে না। এই বঙ্গেরই বরেণ্য সন্তান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম, শরৎ, রবিঠাকুরকে সামনে রেখে এগোব আমরা।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

With Best Wishes :-

Radha Electricals

Private Limited

Factory :

Jalan Industrial Complex

Gate No. 3, Mouza - Beniara, P.S.- Domjur

Dist. - Howrah - 711 411

With Best Compliments From :

ALLIANCE MILLS (LESSEES) LTD.

18, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Phone : 2243-6401 / 02

Quality manufacturers and leading exporters of hessian cloth and bags, sacking cloth and bags and twine

E-mail : alliance@cal12.vsnl.net.in

Fax : 91-33-22202260

GRAM : ALJUTLES

MILLS

Alliance Jute Mills

Jagatdal 24 Paraganas

Phone : 2581-2745 / 2746 (Bhatpara)

বাংলাদেশ যতটা মুসলমানদের হিন্দুদেরও ততটাই

সাধন কুমার পাল

লেখার শুরুতেই স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্পন্ন সমস্ত মানুষকে অভিনন্দন জানাই। আমি সচেতন ভাবেই বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে অভিনন্দিত করিনি। কারণ বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ এখন ইসলামিক জেহাদি। যাদের সক্রিয়তার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এখন আইসিইউতে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আইসিইউতে রেখেই ভারত বিরোধী, মোদী বিরোধী জেহাদ সাময়িক দমন করে বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করছে। চলমান জেহাদি বিক্ষোভ আন্দোলনকে উপেক্ষা করে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সফরের দ্বিতীয় দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সাতক্ষীরার শ্যামনগরের যশোরেশ্বরী মন্দিরে এবং বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলায় ওড়াকান্দি মন্দিরে পুজো দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে স্মরণ করিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাংলাদেশ যতটা মুসলমানদের ঠিক ততটাই হিন্দুদের।

ওড়াকান্দির হরিচাঁদ মন্দিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে জেহাদ-কবলিত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মনে ভরসা জোগানোর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই ধর্মাচরণকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি বাংলাদেশের জেহাদিদের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে এই সফরের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এমনকী প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাসপোর্ট ভিসা বাতিলের দাবি পর্যন্ত জানালেন। সন্দেহ নেই মমতা ব্যানার্জির তরফে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বাংলাদেশের সফরের বিরোধিতা ইসলামিক জেহাদিদের পাখনায় নতুন পালকের সংযোজন ঘটাবে।

সমস্ত প্রটোকল ভেঙে আঁচলে পদ্মফুল প্রিন্ট করা শাড়ি পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গার্ড অব অনার নেওয়ার সময় লাল কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলাদেশ সেনার ব্যান্ডে বাজছে 'ধনধান্য পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'। গত ২৬

মে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিমান বাংলাদেশে মাটিতে অবতরণের পর এরকমই কিছু দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।

এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বললেন তার সারকথা এটাই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল ভারতের মানুষও। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীমোদী বলেন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমার অংশ নেওয়া প্রথম আন্দোলনগুলোর মধ্যে একটি।'

১৯৭১-এর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'তখন আমার ২২ বা ২৩ বছর বয়স। আরও অনেক বন্ধুদের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য আমি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করি।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থন করায় তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয় বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষের যেমন স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল, তেমন ভারতের মানুষদেরও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি সমান প্রত্যাশা ছিল। 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর করা জঘন্য সেই অপরাধ ও নৃশংতার চিত্র আমাদের রক্তকেও ফুটিয়ে তুলতো। আমরাও নিদ্রাহীন রাত কাটিয়েছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য'। এ সময় সন্ত্রাসবাদের মতো 'অমানবিক কার্যক্রম' আজও সক্রিয় আছে বলে মন্তব্য করে এর পিছনের মতাদর্শ এবং শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান জানান মোদী।

মোদী বলেন, 'এই অমানবিক কর্মকাণ্ডের পিছনে একটি সক্রিয় মতাদর্শ ও শক্তি আজও কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের শুধু সজাগ হলেই হবে না, এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকারও প্রয়োজন।'

বাংলাদেশ ও ভারতের একটি অভিন্ন ঐতিহ্যগত, অভিন্ন উন্নয়ন, অভিন্ন লক্ষ্য এবং কিছু অভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে উল্লেখ করে মোদী বলেন, 'আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বাণিজ্য ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের একই সম্ভাবনা থাকলেও আমরা সন্ত্রাসবাদের মতো হুমকিরও মুখোমুখি হয়েছি।' 'ভারত ও বাংলাদেশের একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া পুরো উপমহাদেশের উন্নয়নের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ,' বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এই অনুষ্ঠানে ভারতের অবদান অকপটে স্বীকার করতে গিয়ে বলেন, '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমার পিতা সমেত আমার পরিবারের সবাইকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। জার্মানিতে থাকার জন্য বেঁচে গিয়েছিলাম আমরা দুইবোন ও আমার দুই সন্তান। এই ভয়ংকর ঘটনার পর আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা ছিল না। তখন ইন্দিরা গান্ধী আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিল্লিতে আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন।' বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অসামান্য অবানের জন্য শেখ হাসিনা সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান ইন্দিরা গান্ধীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

তখন ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর মাস। মুক্তি যুদ্ধ অ্যাকাডেমি ট্রাস্টের উদ্যোগে বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল মুক্তি যুদ্ধের পীঠস্থান ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে চির স্মরণীয় করে রাখতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মুক্তি যুদ্ধ অ্যাকাডেমি ট্রাস্ট। ত্রিপুরার মাটিতেই যেহেতু মুক্তি যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল সেহেতু, ত্রিপুরা থেকেই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে চান মুক্তি যোদ্ধারা। আগরতলা প্রেসক্লাব আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সেসময় এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বাংলাদেশের সাংসদ সদস্য আকম বাহাউদ্দিন বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ না হলে হয়তো বাংলাদেশ আজও স্বাধীন হতো না। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মুক্তি যুদ্ধের পীঠস্থান ত্রিপুরায় এসে ত্রিপুরা সরকার, রাজ্যের জনগণ-সহ সকল স্তরের জনগণের প্রতি তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মুক্তি যুদ্ধের সময় ত্রিপুরার জনসংখ্যার চেয়ের বেশি সংখ্যক বাংলাদেশের জনগণকে ত্রিপুরায় আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো বাঙ্গালিও এক জাতিগোষ্ঠী। ভারত সরকার যদি সহযোগিতা না করত তাহলে একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া মুক্তি যোদ্ধাদের পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব হতো না। ভারতবাসী আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

এর ফলে পাকিস্তানি বাহিনীকে মাত্র ৯ মাসে পরাজয় করা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারত শুধু আশ্রয় ও প্রশিক্ষণই দেয়নি, মিত্র বাহিনী গঠন করে ভারতের সৈন্যরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। ভারতের প্রায় ১৭ হাজার সৈন্য মুক্তিযুদ্ধে বীর গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। জাতীয় জীবনে যখন বাংলাদেশে কোনো সংকট দেখা দেয়, ভারত সরকার তখনই বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরার জনগণ ১ কোটি বাংলাদেশি জনগণকে আশ্রয় দিয়েছেন। এতো বড়ো শরণার্থী শিবির কখনও পৃথিবীতে হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুক্তিযুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেও তাঁরা দেশছাড়া। শেখ হাসিনার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের আমলেও প্রতিদিনই নিরুদ্দেশ হচ্ছেন সংখ্যালঘু হিন্দুরা। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সাধের সোনার বাংলা ছাড়ছেন সংখ্যালঘু হিন্দুরা। 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি- জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' সংক্রান্ত গবেষণা রিপোর্ট এমনই এক উদ্বিগ্ন জনক তথ্য উঠে এসেছে। পরিস্থিতি এমনই যে— 'হিন্দুদের পক্ষে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। আগামী দু'তিন দশক

পরে এদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনও মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গবেষণা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বারকাত। তাঁর দাবি, বিলুপ্ত হতে চলেছেন বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুরা। অধ্যাপক আবুল বারকাতের দাবি, ১৯৬৪ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পাঁচ দশকের এই হিসেব ধরলে প্রতিবছর গড়ে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন হিন্দু নিরুদ্দিষ্ট বা দেশত্যাগে বাধা হয়েছেন। সেই হিসেবে প্রতিদিন দেশ ছেড়েছেন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু। অধ্যাপক আবুল বরকতের গবেষণায় ১৯৬৪-১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের চিত্র যেমন উঠে এসেছে। তেমনই স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে (১৯৭১-২০১৩) সংখ্যালঘু হিন্দুদের দেশত্যাগ ও নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত তথ্য স্থান পেয়েছে। গবেষণায় দেওয়া তথ্য বলেছে, ১৯৯১-২০০১ সালের মধ্যে প্রতিদিন ৭৬৭ জন হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়েছেন। যা এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক। এই সময়ের মধ্যে (১৯৯১-১৯৯৬) বিএনপি-জামাত ইসলামি জোট সরকারের নেত্রী হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া। তারপর দেশের ক্ষমতায় আসে আওয়ামি লিগ। ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন শেখ হাসিনা। ২০০১ সালেই ফের প্রধানমন্ত্রী হন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই নেত্রীর প্রথম দফার শাসনকালেই সর্বাধিক সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করেছেন। পরবর্তীতেও দেশটির সংখ্যালঘু হিন্দুরা বিপুল হারে দেশত্যাগ করেছেন। এই সময়ে পর্যায়ক্রমে কখনও খালেদা তো কখনও হাসিনা ক্ষমতায় এসেছেন। গবেষণার রিপোর্ট মোতাবেক ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৬৭৪ জন হিন্দু নিরুদ্দেশ হয়েছে। এই সময়টিতে ক্ষমতায় ছিল আওয়ামি লিগ। সম্প্রতি একের পর এক সংখ্যালঘু মন্দির ও পাড়া আক্রান্ত হয়। অভিযোগ একটিই, ইসলামকে অবমাননা করা হচ্ছে। উগ্র ইসলামি ধর্মীয় সংগঠনের কর্মীরা এই হামলায় জড়িত।

২০১৯ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অধিকার আন্দোলনের একজন নেত্রী প্রিয়া সাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সে দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ে যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন, তা নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনা- সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় মূলত প্রিয়া সাহার দেওয়া ৩ কোটি ৭০ লক্ষ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিখোঁজের যে তথ্য তাই নিয়ে। প্রিয়া সাহা নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন সেনসাস অনুসারে দেশভাগের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৯.৭ শতাংশ। সংখ্যালঘুদের শতকরা ভাগ যদি এখনো একই রকম থাকতো তাহলে বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লক্ষের বেশি হতো। কিন্তু এখন তা কমে নেমে এসেছে ৯.৭ শতাংশে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় এটাই যে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হতে চললেও বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠী ও মিডিয়া হিন্দুদের ওপর হামলাকে আইন শৃঙ্খলার সমস্যার বাইরে কখনোই এথনিক ক্লিনজিং হিসেবে মানতে রাজি নন।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলায় ওড়াকান্দি মন্দিরে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মতুয়া সম্প্রদায়ের কাছে এই মন্দিরের গুরুত্ব অপরিসীম। মতুয়াদের একটা বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। মতুয়া সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মস্থান ওড়াকান্দি। মতুয়া ধর্মমতের প্রবক্তা হরিচাঁদ ঠাকুর। এখানে এই মন্দির দ্বাদশ শতকে গড়ে ওঠে বলে ঐতিহাসিকরা জানিয়েছেন। হরিচাঁদ মন্দিরে পুজো দিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঠাকুর পরিবারের সদস্য ও মতুয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলেন। মোদী তাঁর ভাষণে বলেছেন, হরিচাঁদজীর দেখানো পথে চলে আজ আমরা এক সমান ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের দিকে এগোচ্ছি। তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি মহিলাদের জন্য শিক্ষা ও সামাজিক অংশীদারিত্বের জন্য জোর দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন, নারী শিক্ষার প্রসারে হরিচাঁদ ঠাকুরের অবদান অপীরিসীম। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে হরিচাদ ঠাকুরের ভূমিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন, হরিচাঁদ ঠাকুর ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ছিলেন। তিনি বলেছেন, আজ হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা শুনে মনে হয় উনি ভবিষ্যৎ কালকে আগেই দেখেছিলেন। তাঁর অলৌকিক দিব্য ক্ষমতা ছিল। হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবন আমাদের আরেকটি শিক্ষা দিয়েছে। তিনি ঈশ্বরীয় প্রেমের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এক ধরনের সাধনা। আজ লক্ষ লক্ষ অনুগামী তাঁর দেখানো পথে চলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারত থেকে ওড়াকান্দিতে যে তীর্থযাত্রীরা আসবেন, তাঁদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। মোদী জানান, বাংলাদেশে মেয়েদের স্কুলগুলির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করবে ভারত। বাংলাদেশে ভারত প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করবে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, নিজেদের অগ্রগতির মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বের অগ্রগতি দেখতে চায় ভারত ও বাংলাদেশ। দুই দেশই চায় বিশ্বে অস্থিরতা, সন্ত্রাস ও অশান্তির পরিবর্তে স্থিতিশীলতা, ভালোবাসা ও শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠুক। এই শিক্ষাই হরিচাঁদ ঠাকুর আমাদের দিয়েছিলেন। আজ সমগ্র বিশ্ব যে মূল্যবোধের কথা বলে, তার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আজ যেভাবে ভারত-বাংলাদেশের সরকার দু'দেশের সসম্পর্ককে শক্তিশালী করছে, সামাজিক ভাবে এই কাজই ঠাকুরবাড়ি বহুকাল ধরে করে আসছে। এই স্থান ভারত- বাংলাদেশের আত্মিক সম্পর্কের তীর্থক্ষেত্র। এদিন ভাষণের শেষে মোদীর গলায় 'জয় বাংলা'র পাশাপাশি 'জয় হরিবোল' ধ্বনিও শোনা গেল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের আগে পরে ইসলামিক জেহাদিরা যেভাবে বাংলাদেশকে উত্তাল করে তুলেছে তাতে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে আরও একটি সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন আছে। এই যুদ্ধ হবে বাংলাদেশের মধ্যে পাকিস্তান মনস্কতার বিরুদ্ধে। □

মরুতীর্থ হিংলাজ

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

মেয়ে যাবেন বাপের বাড়ি, তাতে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে থাকে। নাহ্, এমেয়ে কিন্তু যে সে মেয়ে নয়। শক্তিরূপিণী মা মহামায়া। আবার তিনি দেবাদিদেব মহাদের ঘরনি। এও এক ঘটনার ঘনঘটা। পুরাকালে ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষরাজ আদ্যাশক্তি মহামায়াকে কন্যারূপে কামনা করেন। তাঁর কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহামায়া দক্ষরাজ পত্নী অসিক্লীর গর্ভে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষরাজ মেয়ের নাম রাখেন সতী। সতী জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই একাগ্রচিত্তে শিবের আরাধনা করতে থাকেন এবং অন্তরে মহাদেবকেই পতিরূপে বরণ করে নেন। অন্তর্যামী ব্রহ্মা একসময় নারদকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষরাজগৃহে এসে সতীকে আশীর্বাদও করে যান— শিবকে পতিরূপে পাওয়ার কামনা যেন তার পূর্ণ হয়। অতঃপর ব্রহ্মা মহাদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে দক্ষ প্রজাপতির সর্বগুণসম্পন্না কন্যা সতীর শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্যে তপস্যার কথা জানালেন। শিবও তাঁর জন্যে যোগ্য পাত্রীর সন্ধান পেয়ে বিবাহে সম্মতি জানান।

দক্ষরাজ দম্পতির অনিচ্ছা সত্ত্বেও সতীর সঙ্গে শিবের শুভবিবাহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতার উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু কালচক্রে অহংকারী দক্ষরাজের সঙ্গে শিবের মধ্যে বিরোধের বীজ রোপিত হলো। আর তা হলো একসময় নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ যজ্ঞের আয়োজন করলে সেখানে দেবতাগণ ও ঋষিকু ল এবং তাদের অনুচরদের উপস্থিতিতে দক্ষরাজও উপস্থিত ছিলেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ছাড়া সকল দেবতা আসন থেকে উঠে দাড়িয়ে দক্ষকে শ্রদ্ধা জানালেন, কিন্তু শিব দক্ষরাজের জামাতা হয়েও শ্বশুর মহাশয়কে শ্রদ্ধা দেখালেন না। দক্ষরাজ শ্বশুর হিসেবে গুরুজন হয়েও সম্মান না পাওয়াতে অপমানিত বোধ করেন। এবং শিবকে অভিশাপও দিলেন এই বলে যে, শিব দেবতাদেরও অধম তাই শিব দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু মহাদেব সেই অভিশাপের কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। কিন্তু শিবের চর নন্দী দক্ষকে অভিশাপ দিল, যিনি দেবাদিদেবের অপমান করলেন তাঁর মুখ হবে ছাগলের মতো। এভাবেই শুরু হলো দক্ষরাজ ও মহাদেবের মধ্যে বিরোধিতার সূত্রপাত। দেবতা ও ঋষিজগতে যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল। কেননা সেই অভিশাপের ফলে যজ্ঞ করলে তা হবে শিবহীন আর যজ্ঞ করলে তাতে শিবকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না। কিন্তু যজ্ঞ বন্ধ হলেওতো চলে না আর তাই দক্ষরাজ নিজেই হরিদ্বারের কনখলে বিশাল যজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন। সকল দেবতা ও ঋষিকূল নিমন্ত্রিত হলেও শুধুমাত্র মহাদেব ও তাঁর অনুচরেরা বাদ পড়লেন। কিন্তু দক্ষকন্যা সতী পিতার এতবড় মহা যজ্ঞানুষ্ঠানে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। মহাদেব সতীকে পিতৃগৃহে যেতে বারণ করা সত্ত্বেও পিতৃগৃহে যাবার জন্যে তৈরি হলেন এবং সতী মহাদেবকে তাঁর দশমহাবিদ্যা শক্তি--- মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভু বনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা রূপ ধারণ করে নিজের শক্তি প্রদর্শন করে একাকী পিতৃগৃহে উপস্থিত হলেন। কিন্তু দক্ষরাজ নিজ কন্যাকে কোনো সমাদরই করলেন না উপরন্তু মহাদেবকে শ্মশানচারী নিকৃষ্ট দেবতা বলে উপহাস করে অপমানিত করলেন। সতী স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে পিতৃগৃহে যজ্ঞস্থলে সমাধিতে বসেন এবং দেবাদিদেব শিবের স্মরণ নিতে নিতে স্বীয় প্রাণবায়ু ত্যাগ করেন।

সতীর সঙ্গে আসা শিবের অনুচরেরা কৈলাসে ফিরে গিয়ে মহাদেবের গোচরে আনেন সতীর দেহত্যগের সংবাদ। মহাযোগী শিব তাই শুনে প্রচণ্ড ক্রোধে স্বীয় সৃষ্ট বীরভদ্র ও অন্যান্য অনুচরদের পাঠালেন দক্ষরাজের যজ্ঞস্থলে। শুরু হয় যজ্ঞশালায় তাণ্ডবলীলা। বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করে দক্ষের মস্তক ছেদন করেন। তবে দেবতারা পরিশেষে শিবের আরাধনা করে দক্ষের ছিন্ন মস্তকে ছাগলের মাথা বসিয়ে (নন্দীর শাপ পূরণ

করে) সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটান।

এতো গেল এক কাহিনি। কিন্তু এরপর শুরু হয় অন্য কাহিনি। সতীহারা দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষকে পুনর্জীবন দিয়ে সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে ত্রিভু বন পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। আর তাতে স্বর্গের দেবতারা পড়েন মহাফাঁপড়ে। শিবকে মৃত পত্নীর মোহ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু স্বয়ং সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করে কাটতে থাকেন। তারফলে সতীর দেহাংশ যে সব স্থানে পড়েছে সে সব স্থানই কালক্রমে হয়ে উঠেছে এক একটি শক্তিপীঠ। আবার মহাদেবও প্রতিটি পীঠে ভৈরব রূপে শিবলিঙ্গ ধারণ করে বিরাজমান হলেন। এই ৫১ পীঠের প্রেক্ষাপটে রয়েছে অন্য এক পৌরাণিক কাহিনি। শিবপত্নীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করে যে সকল মাতৃপীঠের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠেছে তা ছিল প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। যদিও এই সকল পীঠস্থান একই সময়ে তৈরি হয়নি। তবে খ্রিস্টীয় চতুর্থ অব্দের পূর্ব থেকেই মাতৃপীঠ রূপে জনমানসে প্রকট হয়েছে। দেখা যায় যে শক্তি ও দেবীর মধ্যে সম্পর্ক একরকম অবিচ্ছেদ্যভাবে বিরাজিত। লক্ষণীয় যে, প্রতিটি পীঠস্থানে শক্তিরূপিণী মায়ের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। তেমনিভাবে ভৈরব রূপে মহাদেবও বিরাজিত আছেন ভিন্ন ভিন্ন নামে। এই ৫১টি মাতৃপীঠের বাংলাদেশে ৬টি, নেপাল ও সিংহলে ১টি করে অবশিষ্ট সব কয়টি বর্তমান ভারতে বিদ্যমান । তবে এই মাতৃপীঠ সহ আরও বহু আঞ্চলিক দেবী মহাশক্তি রূপা সতীমায়ের সঙ্গে একীভূতা হয়েছেন। এই ৫১ পীঠের ক্ষেত্রে বেশ কটি পীঠের সঠিক স্থান আজও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়নি। আমার সৌভাগ্য যে এই পুণ্য ৫১ মাতৃপীঠের প্রায় ৩২ টি পীঠ যা ভারত ও বাংলাদেশে রয়েছে এবং তার সঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও অন্যান্য তীর্থসমূহ দর্শন করার সুযোগ হয়েছে। আর আমার সেই ভ্রমণ বৃত্তান্ত সম্প্রতি আমার রচিত 'দেবালয় থেকে দেবালয়ে' শিরোনামে ৫০০ পৃষ্ঠার বইতে শতাধিক ছবি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এক সময় পাকিস্তানের হিঙ্গুলা বা হিংলাজ মাতৃপীঠে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলাম। যেহেতু হিংলাজ তীর্থ পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত পাসপোর্ট ও ভিসার একান্তই প্রয়োজন। আর সেই ভিসার জন্যে আমি এবং আমার আরও তিনজন সফরসঙ্গী দিল্লিস্থ পাক হাই কমিশনের অফিসে দু'দুবার যোগাযোগ করে বিফল মনোরথ হয়ে হিংলাজ তীর্থে যাবার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। তবে ইতোপূর্বে যাঁরা হিংলাজ দর্শন করেছিলেন তাদের কিছু তথ্য এবং পাকিস্তানে ভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু বার্তা সংগ্রহ করেছিলাম।

পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের জনমানবহীন মরুভূমিতে লাসবেলা জেলার এক মরু পার্বত্য এলাকার গুহাতে রয়েছে হিঙ্গুলা মায়ের মহাতীর্থ। '৭১ এর পরবর্তী এক সময়ে এই নির্জন জনহীন মরুতীর্থে ৭

Sresth Products Private Ltd.

Regd. Off.-
49, Strand Road,
Kolkata-700 007

Admn. Off. -
67/50, Strand Road,
Kolkata-700 007

With Best Compliments From :-

Rajesh Kankaria

With Best Compliments From :

EPC Electrical Private Limited.

71A, Tollygunge Road, Kolkata - 700 033

Phone :- 24241240/ 7108, Telefax No. 2424-7108
E-mail : epc@epcfans.com
Website : www.epcfan.com

Manufacturer of

Heavy Duty Exhaust Fans, Air Circulator, Mancooler, Axial Flow Fan, Motor

WE HAVE DEALERS ALL OVER INDIA

জনের এক ব্রাহ্মণ পূজারি সেবায়েত পরিবার যারা মন্দিরে হিঙ্গুলা মায়ের সেবা ও আরাধনায় নিয়োজিত ছিল মুসলমান মৌলবাদী জঙ্গিরা পুরো পরিবারকে হত্যা করে মাথাগুলো ধর থেকে বিচ্ছিন্ন করে মন্দিরে সাজিয়ে রেখেছিল। অথচ এমনি নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। যাইহোক, একসময় এক দল তীর্থ পর্যটক ভারতীয় সরকারি প্রতিনিধিসহ পাকিস্তানে হিঙ্গুলা তীর্থ দর্শনে গিয়েছিলেন। যতদূর সম্ভব সেই দলে আদবানীজীও ছিলেন বলে শুনেছি। তাঁরা হিংলাজ মাতৃদর্শনে গিয়ে জানতে পারেন যে হিংলাজে পুরোহিতদের হত্যার পর থেকে সেখানে কোনো পুরোহিত ছিল না অর্থাৎ মায়ের সেবা ও আরাধনা একরকম বন্ধই ছিল এবং দর্শনার্থীরাও ভয়ে মন্দিরে যেতেন না। তবে ভারতীয় প্রতিনিধি দল দেশে ফিরে এসে সরকারিভাবে হিংলাজ মায়ের মন্দিরে পূজা ও সেবা করার জন্য ভারতের কয়েকজন পূজারিকে নিয়োগ করেছিলেন। আজও তাঁরা মন্দিরে সেবায়েত হিসাবে কর্তব্যরত রয়েছে বলেই জানা গেছে। এই হিঙ্গুলাতে পতিত হয়েছিল সতীমায়ের ব্রহ্মরন্ধ্র। মন্দিরে মায়ের ভৈরব রূপে ভীমলোচন মহাদেব প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। সতীমা সেখানে কোট্টারীশা নামে পরিচিতা। পীঠ নির্ণয়ের বর্ণনায় শাস্ত্রে রয়েছে সতীমায়ের অঙ্গপতনের প্রথম তীর্থ অর্থাৎ

'ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ

কোট্টরীসা মহাদেবী ত্রিগুণায়া দিগম্বরী।'

কিন্তু মরুতীর্থ পার্বত্য গুহাভ্যন্তরে সতীমায়ের কোনো প্রতিমূর্তি নেই। জ্যোতিঃস্বরূপ সতীমাতা এখানে বিরাজিত। আমরা দেখি যে যত দেবীপীঠ আছে সর্বত্রই শিলীভূতরূপে দেবীর অবস্থিতি রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই দেবীর প্রতিমা রূপের কল্পনায় ছিল না। তাছাড়া এই প্রতিমারূপের মূর্তি পূজার পরিকল্পনা এসেছে অনেক পরে। হিঙ্গুলা মায়ের জ্যোতিরূপ দর্শন ভক্তদের কাছে এক অলৌকিক মাতৃদর্শন। সতীমায়ের উদ্দেশে নিরাবয়ব জ্যোতিকে শুধুমাত্র ফুল ও সিঁদুর দিয়ে ভক্ত দর্শণার্থীরা আত্ম নিবেদন করে থাকেন। হিংলাজ বা হিঙ্গুলার হিঙ্ শব্দটি সামগানেই প্রথমে উচ্চারিত শব্দ হিসেবে উল্লেখিত রয়েছে। অর্থাৎ জলন্ত অগ্নি স্ফুরণ হবার সময় হিঙ্ শব্দ করে সব সময় অগ্নি প্রজ্বলন হয়ে থাকে। হিংলাজে সতীমায়ের কোনো মন্দিরের স্থাপনা নেই। মরুভূমির পার্বত্য অঞ্চলের সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্যে নিকষ অন্ধকারে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আভার ন্যায় জ্যোর্তিময় অগ্নি ঝলক হয়ে হিংলাজমাতা চিরকালীন প্রজ্বলিত প্রকৃতি রূপে বিরাজমান রয়েছেন যুগযুগ ধরে। ঐতিহাসিকদের বিবরণে জানা যায়, এই হিংলাজ মাতাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে যেমন কুষাণ রাজাদের 'নন' দেবী, কেউ বলেন সতীমা হলো সুমেরীয় 'ইন্নিনী', প্যালেস্টাইনের 'নিনা' ও ঋগ্বেদের 'নানা'। আবার ব্যাবলিনের ইস্তার কিংবা অথর্ববেদে বনদেবী 'ইন্দ্রাণী' বলেও পরিচিতি লাভ করেছে। পাকিস্তানের এই উষর মরুর দেশ বালুচিস্থানকে বলা হয়''ইন্দ্রাণী' বা 'নানির' দেশ। স্থানীয় জনগণ এই মন্দিরের দেবীকে মহামায়া বা নানি বলেই সম্বোধন করে থাকে। হিংলাজ মাতাকে পাকিস্তানের হিন্দুরা যথেষ্ট সম্মান করে থাকে। এবং মায়ের দর্শন করাকে তারা বলে থাকে 'নানি কি হজ্ব'। এই হিংলাজে যেহেতু সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পতিত হয়েছিল তাই একে ৫১ শক্তিপীঠের প্রথম পীঠ বলেই শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। অতীতে এই পীঠস্থলে যাওয়ার ব্যবস্থা বলে তেমন একটা ছিল না। হয়তো-বা পদব্রজে কিংবা মরুর জাহাজ উঠ ছিল একমাত্র বাহন। সর্বোপরি ছিল যাত্রাপথে দস্যু তস্করের দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়। অনাহার জলকষ্টে প্রাণ সংশয় হওয়া। আর এমনিতরো ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছিলাম অবধূতের উপন্যাস 'মরুতীর্থ হিলাজ'-এর চলচ্চিত্রায়নে। এই বিখ্যাত উপন্যাসটি আমি কয়েকবার পড়েছি। কিন্তু এতে হিংলাজ যাওয়ার পথ নির্দেশিকা তেমন নেই বললেই চলে। এই মহান তীর্থে যেতে হলে যা প্রয়োজন তা হলো পাসপোর্ট ও ভিসা। প্লেনে হোক বা স্থলপথে রেলে বা বাসে করাচী পৌঁছে সেখান থেকে যানবাহনে বালুচিস্থানের হাইওয়ে ধরে সিন্ধু আর বালুচিস্তানের সীমানায় পৌঁছে হেঁটে বা গাড়িতে কিংবা উটের পিঠে চড়ে ১৫০ কি.মি. নির্জন ধুধু তপ্ত বালিময় মরুভূমি পেরিয়ে লাসবেলা গিয়ে তবেই হিংলাজ পৌছানো যাবে। যাত্রার শুরুতেই নানাবিধ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। করাচী থেকেই পাকিস্তানি পুলিশের এসকর্ট থাকা একান্ত প্রয়োজন। আর নাগরিকত্ব ও ব্যক্তিগত সকল পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র সঙ্গে রাখতেই হবে। অন্যথা স্থানীয় পুলিশ ও পাকিস্তানি স্পেশাল পুলিশের হাতে এই দীর্ঘপথ যাত্রায় যেকোন মুহূর্তে হেনস্থা হতেই হবে। এমনকী হিংলাজ তীর্থ দর্শনের পরিবর্তে জেল হাজতবাস অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র ভারতীয় তীর্থযাত্রী ও পর্যটকদের ক্ষেত্রেই কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অথচ বিশ্বের অন্যান্য দেশের কোন পর্যটকের জন্য করা হয় না। যার একমাত্র কারণ ভারত হলো পাকিস্তানের একমাত্র চরম শত্রু দেশ।

অতীতে যে সকল হিন্দু তীর্থযাত্রী হিংলাজ যেত তারা হয় বালুচিস্তানের মরুভূমিতে দুর্ধর্ষ ডাকাত কিংবা দস্যুদের কাছে সর্বস্ব হারিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মাতৃশক্তি পীঠ দর্শন থেকে বঞ্চিত হতো। আজও তাই হয়ে চলেছে। হয়তো বা দু'একজন সৌভাগ্যবান সতীমায়ের দর্শনলাভে সক্ষম হয়েছে। আর এখন পাক সরকারের সংখ্যালঘু নিষ্পেশনের যাতাকলে পাকিস্তানি হিন্দুরাই নিশ্চিহ্ন হবার পথে। হয় জবরদস্থিভাবে ধর্মান্তরিত হচ্ছে নতুবা ভারতে উদ্বাস্তু হচ্ছে। আর হিন্দু শুন্য পাকিস্তানের হিন্দু পীঠস্থানগুলো বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে তা জানার উপায় নেই।

বালুচিস্থানের মরু পার্বত্য গুহাভ্যন্তরে সতীমায়ের এই প্রখ্যাত মন্দিরে প্রধান ট্রাস্টি হলেন ভার্সিল দিওয়ানী নামে একজন ব্যক্তি। যিনি করাচী শহরের স্বামী নারায়ণ মন্দিরে দেবীর একটি কল্পিত মূর্তি স্থাপন করে পূজা অর্চনা করে থাকেন। এই হিংলাজ বা হিঙ্গুলা মায়ের প্রতিমূর্তি দেখতে অনেকটা বালুচ রমণীর প্রতিচ্ছবিই মনে হয়। তবে যে সকল ভারতীয় এবং বিদেশী হিন্দু তীর্থযাত্রী হিংলাজ মাতার দর্শনে যাবেন তারা মায়ের মন্দিরে যাবার পথে মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন, সেখান একটি মিউজিয়াম, বৌদ্ধদের কুষান আমলের স্তূপ, কলন্দর শাহের দরগা, রুপোর গণেশ মন্দির, স্বামী নারায়ণ মন্দির, মাকালির কালীমন্দির ও শিখ টেম্পল দর্শন করে নিতে পারেন। ◻

"মানুষ যদি আত্মশক্তিতে বলিয়ান না হয়, তবে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে যদি বিশ্বের সব সম্পদ ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলেও তার উন্নতি সম্ভব নয়।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

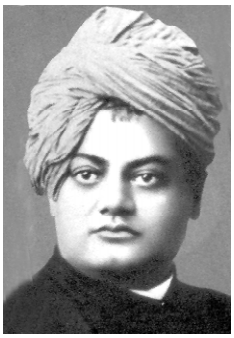

A Well Wisher

(A.B.)

With Best Compliments

From :

S E Builders and Realtors Ltd.

'Vishwakarma', 86C, Topsia Road (South)
Kolkata, Pin - 700 046